মাসিক
পৃথিবী
ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

মার্চ ২০২৬
ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩২
রমাদান-শাওয়াল ১৪৪৭
বর্ষ ৪৫
সংখ্যা ০৬

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ॥ ৩
দারসুল কুরআন
কুরআন বিমুখ হওয়ার পরিণতি ॥ ৪
দারসুল হাদীস
ঋণদান ও ঋণ পরিশোধ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ ॥ ১৫
চিন্তাধারা
মুক্তিযুদ্ধ-'৭১ : পঁচিশ-পূর্ব সংলাপের অন্তরাল-কাহিনী
আবুল আসাদ ॥ ২৪
ফাত্ওয়া ও ফাত্ওয়াদানের যোগ্যতা
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ॥ ৩৯
আন্তর্জাতিক
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে অপহরণ
মীযানুল করিম ॥ ৫১
প্রশ্নোত্তর ॥ ৫৯
বিআইসি বিজ্ঞাপন ॥ ৬৩

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫-এর পক্ষে ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ :

সম্পাদকীয় বিভাগ : ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০; ফোন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫, ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web : www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

ISSN : 1815-3925

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মাসিক পৃথিবী'র নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- ✳ প্রতি কপি পত্রিকার গায়ের মূল্য ৫০ টাকা।
- ✳ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✳ এজেন্সীর জন্য অগ্রিম টাকা দিতে হয়।
- ✳ কোনো জামানত রাখতে হয় না।
- ✳ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ডাক ও কুরিয়ার যোগে পাঠানো হয়।
- ✳ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✳ অবিক্রিত কপি ফেরত নেয়া হয় না।
- ✳ ৫ কপি থেকে ২৫ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়।
- ✳ ২৬ কপি থেকে ১০০ কপির জন্য ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

বিভিন্ন দেশে প্রতি কপি পত্রিকা পাঠানোর বার্ষিক ডাক খরচ

দেশের নাম	সাধারণ ডাক খরচ	রেজিঃ ডাক খরচ
✳ বাংলাদেশ	৭০০/-	৭০০/-
✳ ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল	১৩৫০/-	১৬০০/-
✳ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া	১৬০০/-	১৯০০/-
✳ আফ্রিকা, ইউরোপ	২৬০০/-	২৮০০/-
✳ আমেরিকা, ওশেনিয়া	২৮০০/-	২৯০০/-

২. টাকা পাঠানোর নিয়ম

- ✳ গ্রাহক হবার জন্য মানি অর্ডার/চেক/ব্যাংক ড্রাফট- 'মেসার্স পৃথিবী' হিসাব নং-১০৮৫ (২০৫০২১৫০২০০১০৮৫১০) এম.এস.এ, ইসলামী ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা এই নামে অগ্রিম পাঠাতে হয়।
- ✳ অথবা ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০ নাম্বারে বিকাশ মার্চেন্ট পেমেন্ট করা যায়।
- ✳ পত্রিকা বৃদ্ধি করা/কমানো বা পত্রিকার বিল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫

ম্যানেজার

সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশন বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web: www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

সম্পাদকীয়

মার্চ মাস বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাস। গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের ষড়যন্ত্র, অন্যায় ও জুলুমের নাগপাশ থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য ১৯৭১ সালের এই মাসের ২৬ তারিখেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। তারপর দীর্ঘ নয়মাস সংগ্রামের পর অনেক রক্ত ও জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে বিজয়।

যে চেতনার ভিত্তিতে স্বাধীনতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তাহলো জুলুম, শোষণ ও বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে একটি ন্যায়ানুগ সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠা, মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা, গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখা এবং সুশাসন সুনিশ্চিত করা। কিন্তু স্বাধীনতার ৫৪ বছর অতিক্রান্ত হলেও সেগুলো এখনো সুনিশ্চিত হয়নি।

স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে এবং এর সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছাতে হলে এগুলোর কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় সুশাসনের কোনো বিকল্প নেই।

কিন্তু দুঃখজনক হলো যে, সুশাসনের সোনার হরিণ এখনো নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে। বিপরীতে শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকাতেই বারবার ঠাই হচ্ছে এদেশের। ব্যাংক ব্যবস্থাসহ আর্থিক খাতে লুটেরাদের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। জুলুম, নিপীড়ন ও বৈষম্য হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে বেড়েই চলছে। এগুলো আমাদের স্বাধীনতার চেতনা ও স্বাধীনতার সুফলকে ক্ষতবিক্ষত ও ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। তাই এগুলোর থাবা থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে, অর্থবহ করতে হবে স্বাধীনতাকে। এজন্য স্বাধীনতার এ মাসে প্রতিটি নাগরিককে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য সততা ও স্বচ্ছতার সাথে কাজ করার শপথ নিতে হবে এবং সরকারকে শপথ নিতে হবে সুশাসন নিশ্চিত করার। তাহলেই দেশ এগিয়ে যাবে, স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারবে দেশের প্রতিটি নাগরিক এবং স্বাধীনতার জন্য যারা জীবন দিয়েছেন তাদের স্বপ্নও হবে বাস্তবায়িত।

স্বাধীনতার সুরক্ষা, কার্যকর উন্নয়ন, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন খুবই জরুরী। দ্বিধা বিভক্ত বা বহুধা বিভক্ত জাতি কখনো দুর্বার গতিতে সামনের দিকে এগুতে পারে না। এজন্য সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য গঠনের কোনো বিকল্প নেই। তাই স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় করার জন্য সকল বিভেদের ভেদ রেখাকে মুছে ফেলে জাতীয় ঐক্য গঠন এবং সকল দুর্নীতিকে ঝেড়ে ফেলে সুশাসন কায়েম করতে হবে। এটিই হোক স্বাধীনতা দিবসে আমাদের দৃপ্ত শপথ। ■

কুরআন বিমুখ হওয়ার পরিণতি

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

{وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى}

অনুবাদঃ 'আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকবে, নিশ্চয় তার জীবন– যাপন হবে সংকুচিত এবং আমরা তাকে কিয়ামাতের দিন অন্ধ অবস্থায় জমায়েত করব। সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় জমায়েত করলেন? অথচ আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। তিনি বলবেন, এরূপই আমাদের নিদর্শনাবলী তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি ছেড়ে দিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তোমাকেও (জাহান্নামে রেখে) ভুলে যাওয়া হবে। আর এভাবেই আমরা প্রতিফল দেই তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে ও তার রবের নিদর্শনের প্রতি ঈমান আনে না। আর আখিরাতের শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর ও অধিক স্থায়ী'। [সূরা ত্ব-য়াহা, ২০ : ১২৪-১২৭।]

নামকরণঃ সূরার প্রথম শব্দ **طه** কেই এ সূরার নাম হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এ শব্দটি হুরুফে মুকাত্তা'আতের অন্তর্ভুক্ত। এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। যদিও সত্যনিষ্ঠ 'আলিমগণ এর কিছু অর্থ করেছেন, যেমন হে মানব! বা হে পুরুষ!।[১]

নাযিলের প্রেক্ষাপটঃ সূরাটি মাক্কী সূরা। কোন কোন তাফসীরবিদ মনে করেন যে, সূরা মারইয়াম যে সময় নাযিল হয় এ সূরাটিও তার কাছাকাছি সময়েই নাযিল হয়। সম্ভবত হাবশায় হিজরাতকালে অথবা তার পরবর্তীকালে এটি নাযিল হয়।

মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তুঃ মহাগ্রন্থ আল–কুরআন মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীণ মুক্তি ও আল্লাহর নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির উপযুক্ত বানানোর জন্য নাযিল করা হয়েছে। আল–কুরআনকে মানুষের অকল্যাণের জন্য নয় বরং ভাগ্যোন্নয়নের জন্য নাযিল করা

১. তাফসীর ইবন কাসীর ৫/২৭১।

হয়েছে। মূসা ও অন্যান্য নাবী ('আ) এর কাহিনী তুলে ধরার মাধ্যমে শেষ নাবীকে নবুয়াত ও রিসালাতের মৌলিক বিষয়গুলোকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন, তাওহীদ ও আখিরাতের দা'ওয়াত দেয়া, কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে তাদেরকে দাঁড় করানো, তাদের সাথে কুফরী শক্তির আচরণ, দেব– দেবতা এবং অসত্য উপাস্যদের অসারতা তুলে ধরা, শাইতান মানুষের প্রকৃত চির শত্রু, তার থেকে সাবধান করা এবং আল–কুরআনকে মানুষের প্রকৃত কল্যাণের গ্রন্থ হিসেবে তুলে ধরা এবং এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সবর ও ধৈর্য ধারণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এ সুরাটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

তাফসীর ও ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহর বাণী, **{وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي} 'আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকবে'।** মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ আয়াতগুলোতে স্থান, কাল ভেদে সকল মানুষের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে; যাতে করে তাদের সামনে যুক্তি পেশ করার কোন সুযোগ না থাকে এবং তাদের জন্য সতর্কবাণী হয়। ফলে তারা সাবধান হবে এবং চিন্তা–ভাবনা করার সুযোগ পাবে। অতঃপর তারা এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনাতে দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ– শান্তির যে উপায় বলা আছে, তা বাস্তবে কার্যকরী করবে। সে উপায়টি হলো আল্লাহর যিক্‌র তথা আল–কুরআনকে অনুসরণ করা। যিক্‌র শব্দের অর্থ স্মরণ করা। এ আয়াতে 'যিকর' দ্বারা অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণের নিকট কুরআন বুঝানো হয়েছে।[২] ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন, আল্লাহর যিক্‌র অর্থাৎ তাঁর বাণী, যা তিনি তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন। আর তা থেকে মুখ ফিরানোর অর্থ, কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা–ভাবনা না করা এবং এর বিধান অনুযায়ী কাজ করা ছেড়ে দেয়া।[৩] অন্যান্য আয়াতও এর সমর্থন করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ}

'আর এ হচ্ছে বরকতময় উপদেশ (কুরআন), এটা আমরা নাযিল করেছি। তবুও কি তোমরা এটাকে অস্বীকার কর'। [আল– আম্বিয়া– ২১: ৫০]।

কোন কোন মুফাস্‌সির 'যিক্‌র' দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও হতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

{فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا. رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ}

'অতএব তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! যারা ঈমান এনেছ। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন এক উপদেশ, এক রাসূল, যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে'। [আত্– তালাক– ৬৫: ১০-১১]।

---

২. তাফসীরুল বাগাভী ৫/৩০০, তাফসীরুল কুরতুবী ১১/২৫৮, ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর ৫/২৭৫, ফাতহুল কাদীর ৫/৩৪, আস্– সা'দী, তাইসীরুল কারীম, পৃ. ৪৬৪।

৩. ইবনুল কাইয়্যেম, আল– ফাওয়ায়িদ ১/১৬৮।

অর্থাৎ এ আয়াতে ذِكْرًا رَسُولاً বলা হয়েছে।[4] আয়াতের মূল কথা হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল– কুরআনের বিধি–বিধান ও নির্দেশের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; অন্যদের থেকে হিদায়াত গ্রহণ করে, তার পরিণাম এই যে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে।[৫]

আল্লাহ সুবাহানাহুর বাণী, {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا} 'নিশ্চয় তার জীবন– যাপন হবে সংকুচিত'। আল– কুরআনের আয়াতে ঐ সমস্ত লোকদের জন্য সংকীর্ণ ও তিক্ত জীবনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যারা আল্লাহর কুরআন ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পথে চলতে বিমুখ হয়। الْمَعِيْشَةُ الضَّنْكُ এর الضَّنْك এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সংকীর্ণতা ও কঠোরতা।[৬]

কিন্তু কোথায় তাদের সে সংকীর্ণ ও তিক্ত জীবন হবে তা নির্ধারণেও কতিপয় মত রয়েছে, যেমন;

এক.তাদের দুনিয়ার জীবন সংকীর্ণ হবে। তাদের কাছ থেকে অল্পে তুষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ– লালসা বাড়িয়ে দেয়া হবে। যা তাদের জীবনকে অতিষ্ট করে তুলবে। ফলে তাদের কাছে যত অর্থ– সম্পদই সঞ্চিত হোক না কেন, আন্তরিক শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সদা– সর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশংকা তাদেরকে অস্থির করে তুলবে। কেননা, সুখ– শান্তি অন্তরের স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততার মাধ্যমেই অর্জিত হয়; শুধু প্রাচুর্যে নয়।[৭]

দুই. 'সংকীর্ণ জীবন' বলতে কবরের জীবনকে বোঝানো হয়েছে।[৪] অর্থাৎ তাদের কবর তাদের উপর নানা প্রকারের শাস্তির মাধ্যমে সংকীর্ণ হয়ে যাবে। এতে করে কবরে তাদের জীবন সুর্বিসহ করে দেয়া হবে। তাদের আবাসস্থল কবর তাদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, তাদের পাঁজর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং مَعِيشَةً ضَنْكًا এর তাফসীরে বলেছেন যে, এখানে কবর জগত ও সেখানকার আযাব বোঝানো হয়েছে।[৯] তাছাড়া বিভিন্ন সাহীহ হাদীসে কবরের জীবনের বিভিন্ন শাস্তির যে বর্ণনা এসেছে, তা থেকেও বুঝা যায় যে, যারা আল্লাহ, কুরআন ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত দীন থেকে বিমুখ হবে, কবরে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মু'মিন তার কবরে সবুজ প্রশস্ত উদ্যানে অবস্থান করবে আর তার কবরকে ৭০ গজ প্রশস্ত করা হবে। পুর্ণিমার চাঁদের আলোর মত তার কবরকে আলোকিত করা হবে। তোমরা কি জান আল্লাহর আয়াত "তার জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবন" কাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে? তোমরা কি জান সংকীর্ণ জীবন কি? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তা হল কবরে কাফিরের শাস্তি। যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে

---

৪. তাফসীরুল কুরতুবী ১১/১৭১।
৫. তাফসীর ইবন কাসীর ৫/৩২২।
৬. ইবন মানযূর, লিসানুল 'আরব ৫/৯৩।
৭. দেখুন, তাফসীর ইবন কাসীর ৫/৩২২– ৩২৩, আশ্– শাওকানী, ফাতহুল কাদীর ৫/৩৪।
৮. ইবন কাসীর ৫/৩২৩, ফাতহুল কাদীর ৫/৩৫।
৯. আল– হাকিম, আল– মুস্তাদরাক ২/৩৮১, নং ৩৪৩৯, সাহীহ ইবন হিব্বান ৭/৩৮৮– ৩৮৯, নং ৩১১৯।

বলছি! তাকে ন্যস্ত করা হবে ৯৯টি বিষাক্ত তিন্নীন সাপের কাছে। তোমরা কি জান তিন্নীন কি? তিন্নীন হল ৯৯টি সাপ। প্রত্যেকটি সাপের রয়েছে ৭টি মাথা। যেগুলো দিয়ে সে কাফিরের শরীরে ছোবল মারতে থাকবে, কামড়াতে ও ছিঁড়তে থাকবে কিয়ামাত পর্যন্ত।[১০]

তিন. জাহান্নাম, অর্থাৎ জাহান্নামে তারা কঠোর ও কঠিন শাস্তির মধ্যে জীবন যাপন করবে। তবে সংকীর্ণ জীবন ভোগ করার স্থানের ক্ষেত্রে সঠিক কথা হচ্ছে, মানুষ যেসব স্থানে থাকবে সেখানেই সে আল- কুরআন থেকে বিমুখ হওয়া এবং এটাকে উপেক্ষা করার কারণে সংকীর্ণ জীবন ভোগ করবে। দুনিয়াতে থাকাকালীন সময়ে দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা ও অশান্তির দাবানলে জ্বলতে থাকবে। আর এটা হচ্ছে তার জন্য দ্রুত শাস্তি। মানব জীবনের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে বারযাখ বা কবরের জীবন। সেখানে তাকে নানাবিধ কঠিন ও কঠোরতর শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর মানুষের তৃতীয় ও চূড়ান্ত স্তর হচ্ছে পরকালীন জীবন। সেখানে তাকে আর ভয়াবহ, আরও কঠিন ও ভীষণ যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি ভোগ করতে হবে।[১১] আশ্-শানকীতী (রহ) বলেন, 'সংকীর্ণ জীবন' সম্পর্কে যতগুলো মত উল্লেখ করা হয়েছে, এ আয়াত সবগুলোকেই শামিল করে।[১২] বস্তুত বিদ'আতপন্থী, আল্লাহ তা'আলার প্রতি উদাসীন এবং আল-কুরআনকে উপেক্ষাকারী ও পাপীদের অন্তরসমূহ বৃহত্তর জাহান্নামের পূর্বে সাধারণ জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। অপরদিকে পূণ্যবান ব্যক্তিদের অন্তরসমূহ বিশাল স্বাচ্ছন্দের (জান্নাতের) পূর্বে এক সাধারণ স্বাচ্ছন্দের (কবরের) মধ্যে সুখ-শান্তি ভোগ করবে। আল্লাহ তা'আল বলেন,

{إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ}

'নিশ্চয় পূণ্যবানরা থাকবে স্বাচ্ছন্দে, আর পাপাচারীরা তো থাকবে জাহান্নামে'। [আল-ইনফিতার- ৮২: ১৩- ১৪]।

তাদের এই অবস্থা মানব জীবনের তিনটি স্তরেই ঘটবে। এটা কেবল আখিরাতের জন্য নির্দিষ্ট নয়। তবে এটা সত্য যে, পরকালেই এই শাস্তি বা শাস্তি পূর্ণতা পাবে এবং তা পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাবে। আর বারযাখ বা কবরের জীবনে পরকালের চেয়ে কিছুটা কম থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

{وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}

'আর নিশ্চয় যারা যুল্‌ম করেছে তাদের জন্য এছাড়া আরো শাস্তি রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না'। [আত্- তূর-৫২ : ৪৭]।

মহান আল্লাহর বাণী, {وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} 'আর আমরা তাকে কিয়ামাতের দিন অন্ধ অবস্থায় জমায়েত করব'। অর্থাৎ তাকে কিয়ামাতের দিন অন্ধ অবস্থায় হাশর করা হবে। আয়াতে 'অন্ধ অবস্থা' এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে; ১. বাস্তবিকই সে অন্ধ হয়ে

---

১০. মুসনাদ আহমাদ ৩/৩৮, নং ১১৩৫২, সাহীহ ইবন হিব্বান ৭/৩৯২, নং ৩১২২, মুসনাদ আবু ইয়া'লা ১২/৪১১, নং ৬৬৪৪, মাজমা'উয যাওয়ায়িদ ৩/৮১, নং ৪২৮৬।

১১. আর- রাযী, আত্- তাফসীরুল কাবীর ২২/১১২- ১১৩, ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুস সালিকীন ১/৪২২- ৪২৩, আশ্- শানকীতী, আদওয়াউল বায়ান ৪/১২৬, আস্- সা'দী, তাইসীরুল কারীম ৪৬৫।

১২. আদওয়াউল বায়ান ৪/১২৬।

উঠবে। ২. সে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। যেমন আল্লাহ বলেন,

{وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا}

'আর অপরাধীরা যখন জাহান্নাম দেখবে তখন তারা ধারনা করবে যে, তারা সেখানে পতিত হচ্ছে এবং তারা সেখান থেকে কোন পরিত্রাণস্থল পাবে না'। [আল-কাহফ– ১৮: ৫৩]।

৩. পরকালে সে তার পক্ষে পেশ করার মত কোন যুক্তি থেকে অন্ধ হয়ে যাবে।[১৩]

অন্য একটি আয়াতেও এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, তারা অন্ধ, বোবা ও বধির হয়ে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا}

'আর কিয়ামাতের দিন আমরা তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ, বোবা ও বধির করে। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম; যখনই তা স্তিমিত হবে তখনই আমরা তাদের জন্য আগুনের শিখা বৃদ্ধি করে দেব'। [বানু-ইসরাঈল– ১৭: ৯৭]।

অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন তারা সত্যকে দেখতে পেতো না, সত্য কথা শুনতে পেতো না এবং সত্য কথা বলতো না, ঠিক তেমনিভাবেই কিয়ামাতেও তাদেরকে উঠানো হবে। আয়াতে তাদের শাস্তির বর্ণনা হিসেবে আরো বলা হয়েছে যে, 'তারা তাদের মুখের উপর ভর দিয়ে চলবে। আনাস (রা) বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন,

يَا نَبِيَّ اللَّهِ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا

হে আল্লাহর নাবী! কাফির কিয়ামাতের দিন তার চেহারার উপর কিভাবে চলবে? তিনি বলেন, 'যে সত্তা দুনিয়াতে দু'পায়ের উপর হাঁটিয়েছেন তিনি কি কিয়ামাতের দিন তার মুখের উপর ভর দিয়ে হাঁটাতে পারবেন না? কাতাদাহ বলেন, হ্যাঁ আমাদের রবের কসম!'[১৪]

উপর্যুক্ত দলীল– প্রমাণসহ আরো অন্যান্য দলীল থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ ও কুরআন বিমুখ ব্যক্তিগণ কিছুই দেখতে পাবে না, কিছুই শুনতে পাবে না, কোন কথা বলতে পারবে না। আবার কতক দলীল প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, পাপীগণ, জাহান্নাম ও এর শাস্তি দেখে নিশ্চিত হবে যে, তারা সেখানে অবশ্যই পতিত হবে। তাই তাদের কেউ কেউ পৃথিবীতে ফিরে আসার মিনতি জানাবে। পরস্পর বিপরীত এ দলীলগুলোর মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে বিজ্ঞ মুফাসসিরগণ বলেছেন যে, পরকালে দু'ধরনের হাশর হবে; এক. কবর থেকে মাওকিফ বা অবস্থানের ময়দান, দুই. হাশরের ময়দান থেকে স্থায়ী আবাস, জান্নাত বা জাহান্নাম। প্রথম হাশর বা কিয়ামাতের ময়দান; সেখানে তারা শুনতে পাবে দেখতে পাবে, যুক্তি–তর্ক পেশ করতে ও কথাবার্তা বলতে

---

১৩. তাফসীর ইবন কাসীর ৫/৩২৪, ফাতহুল কাদীর ৫/৩৪, তাইসীরুল কারীম, পৃ. ৪৬৫, আদওয়াউল বায়ান৪/১২৮, ইবন 'আশুর, আত্– তাহরীর ওয়াত তানভীর ১৬/২০০।

১৪. সাহীহুল বুখারী ৬/১০৮, নং ৪৭৬০, সাহীহ মুসলিম ৮/১৩৫, নং ৭২৬৫।

পারবে। দ্বিতীয় হাশর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্থায়ী বাসস্থানে তাদেরকে একত্রিত ও সমবেত করা। সেক্ষেত্রে মুত্তাকী মু'মিনদেরকে জান্নাতে সমবেত করা হবে।

যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا}

'যেদিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীগণকে সম্মানিত মেহমানরূপে আমরা সমবেত করব'। [মারইয়াম– ১৯: ৮৫]।

অপরদিকে কাফিরগণকে জাহান্নামে সমবেত করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ}

'একত্র কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে যাদের 'ইবাদাত তারা করত আল্লাহর পরিবর্তে। আর তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে'। [আস্– সাফ্ফাত– ৩৭: ২২– ২৩]।

দ্বিতীয় হাশরে কাফির ও পাপিষ্টদেরকে অন্ধ, বোবা এবং বধির করে মুখের উপর ভর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে তাদেরকে একত্রিত করে জাহান্নামে ফেলা হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলার ইনসাফ ও হিকমাতের দাবী অনুযায়ী প্রত্যেকের সাথে তার উপযোগী অবস্থা অনুযায়ী হাশরের দিনে আচরণ করা হবে।

আল্লাহ সুবহানাহুর বাণী, {قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى} 'সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় জমায়েত করলেন? অথচ আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। তিনি বলবেন, এরূপই আমাদের নিদর্শনাবলী তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তোমাকেও (জাহান্নামে রেখে) ভুলে যাওয়া হবে',। আয়াতে فَنَسِيتَهَا শব্দটি النِّسْيَان থেকে, যার অর্থ, বিস্মৃত হওয়া। এ ছাড়া এর আরেকটি অর্থ রয়েছে, তাহলো: ছেড়ে রাখা, অর্থাৎ যেভাবে আমার হিদায়াতকে দুনিয়াতে ছেড়ে রেখেছিলে তেমনি আজ তোমাদেরকে জাহান্নামে ছেড়ে রাখা হবে।[১৫] আর এটা তো তোমারই কাজের যথোপযুক্ত ফল,। যেমন কর্ম করেছো তেমন ফলই তো পাবে।[১৬] অন্য আয়াতেও এই ভুলে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا}

'কাজেই আজ আমরা তাদেরকে (জাহান্নামে) ছেড়ে রাখব, যেমনিভাবে তারা তাদের এ দিনের সাক্ষাতের জন্য কাজ করা ছেড়ে দিয়েছিল'। [আল-আ'রাফ– ৭: ৫১]।

উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলার বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে কি করুণ পরিণতি ও শাস্তি তাদের জন্য রয়েছে তা বলা হয়েছে। অন্যান্য আয়াতেও আল– কুরআন বিমুখ মানুষদের জন্য আর কিছু শাস্তি এবং খারাপ পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে।[১৭] যেমন:

---

১৫. ইবন কাসীর ৫/৩২৪, ফাতহুল কাদীর ৫/৩৪।

১৬. তাফসীর ইবন কাসীর ৫/৩২৪।

১৭. আদওয়াউল বায়ান ৩/৩০৯– ৩১০।

১. তাদের অন্তরে আবরণ ঢেলে দেয়া হবে; ফলে তারা কখনো সত্যকে বুঝতে ও চিনতে সক্ষম হবে না এবং সঠিক পথও পাবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا}

'আর তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে হতে পারে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে এবং সে ভুলে গেছে যা তার দু–হাত পেশ করেছে? নিশ্চয় আমরা তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা এটাকে (আল–কুরআন) বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে বধিরতা এঁটে দিয়েছি। আর আপনি তাদেরকে সৎপথে ডাকলেও তারা কখনো সৎপথে আসবে না'। [আল– কাহাফ– ১৮: ৫৭]।

২. মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ কুরআন বিমুখদের থেকে কঠিন প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ}

'যে ব্যক্তি তার রবের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী'। [আস্– সাজদাহ –৩২:২২]।

৩. কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তি গাধা সদৃশ। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ}

'অতঃপর তাদের কী হয়েছে যে, তারা উপদেশ (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? তারা যেন ভীত– তটস্থ হয়ে পলায়নরত একপাল গাধা, যারা সিংহের ভয়ে পলায়ন করেছে'। [আল– মুদ্দাস্সির– ৭৪: ৪৯– ৫১]।

৪. বজ্রপাত দ্বারা সতর্ক করা, আল্লাহর কুরআন থেকে বিমুখ ব্যক্তিদেরকে আসমান থেকে বজ্রপাত দিয়ে ধ্বংস করার ভীতি প্রদর্শন ও সাবধান করা হয়েছে, যেমনটি 'আদ ও সামূদ জাতিকে বজ্রপাত দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,

{فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ}

'অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলুন, আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক (ধ্বংসকারী) বজ্রপাত (শাস্তি) সম্পর্কে, 'আদ ও সামূদের বজ্রপাতের অনুরূপ'। [হা–মীম আস–সাজদাহ– ৪১: ১৩]।

৫. দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করানো হবে, আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا}

'আর যে ব্যক্তি তার রবের যিকর (কুরআন) থেকে বিমুখ হয়, তিনি তাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন'। [আল– জিন্ – ৭২: ১৭]।

৬. শাইতান শ্রেণীদেরকে তার সহচর নিয়োগ করা হয়, যারা আল– কুরআন হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের উপর শাইতান ও তার সাঙ্গ– পাঙ্গরা চেপে বসে। তারা সর্বদা তাদের কথা মত চলে। আল্লাহ জাল্লা ওয়া 'আলা বলেন,

{وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ}

'আর যে রাহমানের যিকর থেকে বিমুখ হয়, আমরা তার জন্য একজন শাইতান নিয়োজিত করি, অতঃপর সে হয় তার সহচর। আর নিশ্চয় তারাই (শাইতানরা) মানুষদেরকে সৎপথ থেকে বাধা দেয়, অথচ মানুষরা (ভ্রষ্ট পথে থাকার পরও) মনে করে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত'। [আয্– যুখরুফ– ৪৩: ৩৬– ৩৭]।

অর্থাৎ শাইতানরা সে সমস্ত লোকদেরকে সৎপথ থেকে দূরে রাখে, যারা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ। শাইতানরা স্মরণবিমুখ লোকদের জন্য ভ্রষ্ট পথকে সুশোভিত করে দেখায়। আর আল্লাহর উপর ঈমান ও সৎকাজ করাকে অপছন্দনীয় করে রাখে। এছাড়া তাদের জন্য আরো অনেক কঠিন শাস্তি রয়েছে।

৭. কুরআন উপেক্ষাকারীদের জন্য আরেকটি করুণ পরিণতি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামাতের দিন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করবেন। সে কথাটি আল্লাহ আল– কুরআনে তুলে ধরেছেন। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,

{وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا}

'আর রাসূল বললেন, হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় তো এ কুরআনকে পরিত্যজ্য সাব্যস্ত করেছে'। [আল– ফুরকান– ২৫: ৩০]।

আল্লাহর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই অভিযোগ কিয়ামাতের দিন হবে, না এই দুনিয়াতেই অভিযোগ করেছেন, এ ব্যাপারে তাফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান রয়েছে।[১৮] পরবর্তী আয়াতে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি দুনিয়াতেই এই অভিযোগ পেশ করেছেন এবং জওয়াবে তাকে সান্তনা দেয়ার জন্য পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا}

আর এভাবেই আমরা প্রত্যেক নাবীর জন্য অপরাধীদের থেকে শত্রু বানিয়ে থাকি। আর আপনার রবই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট'। [আল– ফুরকান– ২৫: ৩১]।

এ প্রসঙ্গে অন্য আয়াতেও আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

'আর এভাবেই আমরা মানব ও জিনের মধ্য থেকে শাইতনদেরকে প্রত্যেক নাবীর শত্রু করেছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তারা একে অপরকে চমকপ্রদ বাক্যের কুমন্ত্রণা দেয়। যদি আপনার রব ইচ্ছা করতেন তবে তারা এসব করত না; কাজেই আপনি তাদেরকে ও তাদের মিথ্যা রটনাকে পরিত্যাগ করুন'। [আল– আন'আম – ৬: ১১২]।

অর্থাৎ এসব কাফিরগণ যদি আপনার সাথে শত্রুতা করে, তবে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। পূর্ববর্তী সমস্ত নাবীদেরও অব্যাহতভাবে শত্রু ছিল। তারাও নাবী– রাসূলগণ যা নিয়ে

---

১৮. তাফসীরুল কুরতুবী ১৩/২৭।

আসত, তার বিরুদ্ধে লেগে যেত। অতএব আপনি সান্তনা গ্রহণ করুন এবং তাদের আচরণে মনঃক্ষুন্ন হবেন না। আপনার সবর করা উচিত যেমন অন্যান্য নাবীগণ এর প্রেক্ষিতে সবর করেছেন।[১৯] আল্– কুরআনকে পরিত্যাজ্য করার বাহ্যিক অর্থ কুরআনকে অস্বীকার করা, যা মূলতঃ কাফিরগণেরই কাজ। তাদের সামনে কুরআন যখন পাঠ করা হত তখন তারা অন্য বিষয় ও প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক বেশী কথা বলত এবং রীতিমত শোর–গোল করত; যাতে করে তারা কুরআন শুনতে না পায়। কুরআনের প্রতি ঈমান পোষণ না করা একে সত্য বলে স্বীকার না করা। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যে মুসলিম কুরআনে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু রীতিমত তিলাওয়াত করে না এবং 'আমলও করে না, চিন্তা– গবেষণা করে না। এর আদেশ মানে না এবং নিষেধকে পরিত্যাগ করে না। কুরআনকে বাদ দিয়ে গল্প, কবিতা, গান– বাজনাসহ অন্যান্য অনর্থক কর্মের মধ্যে লেগে যাওয়া ইত্যাদিও এই বিধানের অন্তর্ভূক্ত। দীনের মৌলিক ও শাখা– প্রশাখাসহ সকল বিষয়ের ফায়সালা এবং হালাল ও হারামের বিধান কুরআন থেকে না নেয়াও কুরআন থেকে বিমুখ হওয়া।[২০] বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি কারো বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার নিকট অভিযোগ দায়ের করেন, তাহলে তার কি আল্লাহ তা'আলার করুণা ও দয়া– অনুগ্রহ পাওয়ার আশা আছে? তার জীবন তো অনিবার্য ধ্বংসের গহ্বরে পতিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, যারা কুরআন বিমুখ হবে এবং পার্থিব জীবনের ভোগ– বিলাসমুখী হবে, তাদের থেকে তোমরাও মুখ ফিরিয়ে নাও। কারণ তাদের জন্য পরকালে কোন্ বস্তুটি উপকারী তা তাদের কাছে স্পষ্ট নয় এবং সে জ্ঞানও তাদের নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى}

'অতএব আপনি তাকে উপেক্ষা করে চলুন যে আমাদের যিকর (কুরআন) থেকে বিমুখ হয় এবং কেবল দুনিয়ার জীবনই কামনা করে। এটাই তাদের জ্ঞানের শেষ সীমা। নিশ্চয় আপনার রব, তিনিই ভাল জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন কে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে'। [আন্– নাজম– ৫৩: ২৯-৩০]। মহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর কুরআন থেকে বিমুখ ও উদাসীন ব্যক্তির আনুগত্য করার প্রতিও নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا}

'আর আপনি তার আনুগত্য করবেন না, যার অন্তরকে আমরা আমাদের যিকর থেকে গাফিল করে দিয়েছি, যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে ও যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে'। [আল– কাহ্ফ– ১৮: ২৮]।

করুণাময় আল্লাহ বলেন, {وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى} 'আর এভাবেই আমরা প্রতিফল দেই তাকে যে বাড়াবাড়ি করে ও তার রবের নিদর্শনের প্রতি ঈমান আনে না। আর আখিরাতের শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর ও অধিক স্থায়ী। [ত্ব– য়াহা– ২০: ১২৭]।

---

১৯. তাফসীরুল কুরতুবী ১৩/২৭, মা'আরিফুল কুরআন ৯৫৯, আস্– সা'দী, তাইসীরুল কারীম, পৃ. ৫৩০

২০. তাফসীর ইবন কাসীর ৬/১০৮, ইবনুল কাইয়্যেম, আল– ফাওয়ায়িদ, পৃ. ১২৩– ১২৪।

এ আয়াতটির পূর্বের আয়াতে আল্লাহ 'যিকর' অর্থাৎ তাঁর কিতাব ও তাঁর প্রেরিত উপদেশমালা থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের দুনিয়ায় যে 'অতৃপ্ত জীবন' যাপন করানো হয় সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ এভাবেই যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর মিথ্যারোপ করে আমরা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিফল দিয়ে থাকি। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ}

'তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে আছে শাস্তি এবং আখিরাতের শাস্তি তো আরও কঠোর। আর আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার মত তাদের কেউ নেই'। [আর- রা'দ-১৩ : ৩৪]।[২১] 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও লি'আনকারী পুরুষ ও মহিলাকে আখিরাতের শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন,

أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ

'অবশ্যই দুনিয়ার 'আযাব আখিরাতের 'আযাবের চেয়ে অনেক সহজ'।[২২] কোননা দুনিয়ার শাস্তি, তা যত দীর্ঘই হোক না কেন মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু পরকালের শাস্তি স্থায়ী যা কোন দিনও শেষ হবার নয়।

শিক্ষা:

১. 'যিক্‌র' অর্থ আল-কুরআনুল মাজীদ। তাই কুরআন থেকে উদাসীন থাকা এবং কুরআনকে উপেক্ষা করে জীবন পরিচালনা করা করুণ পরিণতি ও কঠিন শাস্তি প্রাপ্তির একটি অনিবার্য কারণ বলে বিশ্বাস করতে হবে।

২. কুরআনকে অবজ্ঞাভরে রেখে দেওয়ার ফলে দুনিয়ার জীবন অপরিহার্যভাবে দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। এ কথা সর্বদা মনে রাখা উচিত।

৩. কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে খেয়াল- খুশী মত জীবন যাপনের ফলে পরকালের নানা ধরনের অপমানজনক শাস্তি আরোপিত হবে। সে বিষয়ে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী।

৪. আল- কুরআন উপেক্ষাকারী ব্যক্তিকে কিয়ামাতের দিন আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হবে। আল্লাহর রাসূল ও আল-কুরআন তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবেন। দুনিয়াতেই সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

৫. আল-কুরআনের সাথে যারা সম্পর্ক রাখে না তাদেরকেও উপেক্ষা করা এবং কোন ক্ষেত্রেই তাদের অনুগামী না হওয়া ঈমানী কর্তব্য।

৬. দুনিয়ার কর্ম অনুযায়ী পরকালের প্রতিদান নির্ধারিত হবে। তাই সৎকর্মের উত্তম প্রতিদান প্রাপ্তির জন্য ইহকালেই সৎকর্ম করা এবং অসৎ কর্ম না করা আবশ্যক।

মহান আল্লাহ আয়াতগুলোর উপরোক্ত শিক্ষার আলোকে আমাদের জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন! আমীন!!!

প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

---

২১. দেখুন তাফসীর ইবন কাসীর।

২২. সাহীহ মুসলিম ৪/২০৬, নং ৩৮১৯।

১৪ নং পৃষ্ঠায়

আবাবিল বিজ্ঞাপন

ঋণদান ও ঋণ পরিশোধ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ آللَّهِ قَالَ آللَّهِ. قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ– يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ.

অনুবাদ

আবদুল্লাহ ইবন আবূ কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, "একদা আবূ কাতাদা (রা) তার এক পাওনাদারের (খাতকের) খোঁজে বের হন। কিন্তু সে তার থেকে আত্মগোপন করেছিলো। পরে তিনি তাকে পেয়ে যান। তখন সে বললো, আমি অভাবগ্রস্ত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! সেও বললো,আল্লাহর শপথ। তিনি (আবূ কাতাদা রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি এতে সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ তাকে কিয়ামত দিবসের বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি দেবেন, সে যেনো অভাবী লোককে দুশ্চিন্তা মুক্ত করে অথবা তার ঋণ মওকূফ করে দেয়"।[১]

ব্যাখ্যা

মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে একে অপরের মুখাপেক্ষী। সমাজবদ্ধ মানুষ যদি একে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে তাহলেই কেবল পৃথিবী বাসযোগ্য হবে। এর ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠবে একটি কাঙ্ক্ষিত সমাজব্যবস্থা। সমাজের সকল মানুষের আর্থিক অবস্থা এক রকম থাকে না। মানুষ কখনো ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আবার কখনো ব্যবসায়িক কাজে ব্যক্তি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। মানুষের একান্ত প্রয়োজনে যেমন ঋণ দেয়া উচিত, অপরদিকে ঋণের টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করাও একজন খাঁটি মুসলিমের পরিচয়। ঋণদানে যেমন সাওয়াব রয়েছে তদ্রূপ অনাদায়ে রয়েছে কঠোর সতর্কবাণী। আমরা এই দারসুল হাদীসে দেখবো ঋণদানের গুরুত্ব কীরূপ এবং তা যথাসময়ে পরিশোধের বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনাই বা কি। প্রথমেই আমরা ঋণ শব্দের অর্থ জেনে নেবো।

---

১. মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাত ওয়াল মুযারা'আত, বাব: ফাদলু ইনযারিল মু'সিরি ওয়াত-তাজাউযি ফিল-ইকতিযায়ি মিনাল মুসিরি ওয়াল মু'সিরি, নং ৪০৮৩

ঋণ শব্দের দুটি আরবী প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। একটি 'আদ-দাইন' (الدين) এবং অপরটি 'করযে হাসানা' (قرضا حسنا)। দাঈন বলতে সাধারণ ঋণ বোঝায়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا .

"হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অপরের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার করবে তখন তা লিখে রাখবে। তোমাদের মধ্যকার কোনো লেখক যেনো তা লিখে দেয় লেখক লিখতে যেনো অস্বীকার না করে, যেমন আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং সে যেনো লিখে দেয়"।[২]

করযে হাসানা বলতে নিঃস্বার্থভাবে দেয়া ঋণ বোঝায়। এই ঋণদানে বিপুল সাওয়াব রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً .

"কে সে, যে আল্লাহকে করযে হাসানা দিবে? তিনি তার জন্য তা বহু গুণে বৃদ্ধি করবেন"।[৩] এ ছাড়াও কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে (২: ২৪৫; ৫ : ১২; ৫৭: ১১,১৮; ৬৪: ১৭; ৭৩ : ২০) করযে হাসানার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

ঋণদানের ফযীলত

কিছু লোক নিত্য প্রয়োজন মেটাতে ঋণ করে আবার কিছু লোক ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ঋণ করে। ঋণ না পেলে তাকে সুদে ঋণ নিতে হয়, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। সুতরাং কোনো ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির প্রয়োজন মেটাতে ঋণ দিলে মহান আল্লাহ তাকে বিপুল পুরস্কার দেন। কুরআন ও হাদীসে ঋণের লেনদেনের ব্যাপারে ব্যাপক নির্দেশনা রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

"যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা (দাবি) ছেড়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা তোমরা জানতে"।[৪]

وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.

"এবং তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করো। আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ মোচন করবো এবং নিশ্চয়ই তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবো, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত"...। (৫, সূরা আল-মায়িদা: ১২)

---

২. ২-সূরা আল-বাকারা: ২৮২
৩. ২-সূরা আল-বাকারা: ২৪৫
৪. ৪-সূরা আন-নিসা: ২৮০

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ.

"যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও তিনি তোমাদের জন্য তা বহু গুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন"... ।[৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – ﷺ – قَالَ « كَانَ الرَّجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا . قَالَ فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ » .

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "এক ব্যক্তি লোকদের ঋণ দিতো। সে তার কর্মচারীকে বলে দিতো, তুমি যখন কোনো অসচ্ছল ব্যক্তির নিকট পাওনা চাইতে যাবে তখন তাকে মাফ করে দিবে। হয়ত এ কারণে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে দিবেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, লোকটি আল্লাহর নিকট সাক্ষাৎ করলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন" ।[৬]

عن ابي اليسر قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– يَقُولُ « مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ ».

আবুল ইউস্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি : "যে ব্যক্তি ঋণ আদায়ে অসমর্থ ব্যক্তিকে সময় দিবে অথবা তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবে আল্লাহ তাকে তাঁর (রহমতের) ছায়া দান করবেন" ।[৭]

কোনো ঋণ পরিশোধে অপরাগ হলে তাকে পাওনাদার সময় দিলে তার জন্য বিশেষ সাওয়াব রয়েছে। যেমন-

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ أَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ ».

ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি তার পাওনাদারকে ঋণ পরিশোধের জন্য সময় দিবে তাকে প্রতি দিনের জন্য সাদাকার সাওয়াব দেয়া হবে" ।[৮]

عَنْ ثَوْبَانَ – مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ –ﷺ– – عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –ﷺ– أَنَّهُ قَالَ « مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلاَثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ.

রাসূলুল্লাহ (স.) এর মুক্ত দাস সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তির আত্মা তিনটি কাজ থেকে মুক্ত অবস্থায় বের হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে: (১) অহংকার, (২) আত্মসাৎ ও (৩) ঋণ" ।[৯]

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ

---

৫. ৬৪-সূরা আত-তালাক: ১৭
৬. বুখারী, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া, বাব: ৫৪, নং ৩৪৮০
৭. মুসলিম, বাব: হাদীসু জাবির আত-তাবীল...-১৯, নং ৭৭০৪
৮. আহমাদ, আল-মুসনাদ, নং ২০৫১২
৯. ইবন মাজাহ, কিতাবুল হেবাত, বাব: আত-তাশদীদু ফিদ-দাইন, নং ২৫০৫

الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ.

আবূ মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের এক ব্যক্তির হিসাব গ্রহণ করা হয় কিন্তু তার কোনো নেক আমল পাওয়া যায়নি। তবে সে মানুষের সাথে ওঠাবসা করতো এবং সে ছিলো সচ্ছল। সে তার কর্মচারীদেরকে অভাবগ্রস্ত লোকদের (কাছে পাওনা) ক্ষমা করার জন্য নির্দেশ দিতো। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, আল্লাহ বলেছেন: এ ব্যাপারে আমি তার চেয়েও অধিক উপযুক্ত। সুতরাং তোমরা তাকে ক্ষমা করে দাও"।[১০]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ .

ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি চায় যে, তার দু'আ কবুল হোক এবং তার বিপদ কেটে যাক, সে যেনো অভাবগ্রস্তদের (ঋণ থেকে) বের হওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দেয়"।[১১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ঋণদানের ফযীলতের বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে জানা সম্ভব হয়েছে।

ঋণ পরিশোধের অপরিহার্যতা

ঋণদান যেমন সাওয়াবের কাজ তদ্রূপ তা মনোমালিন্যের বিষয়ও বটে। তবে তা পরিশোধ না করার ব্যাপারে হাদীসে কঠোর নির্দেশনা এসেছে। যেমন-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ. فَقَالَ رَجُلٌ تَعْدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ قَالَ نَعَمْ.

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) সূত্রে নবী (স.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি কুফ্‌র ও ঋণ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এ সময় এক ব্যক্তি বললো, আপনি ঋণ ও কুফ্‌রকে সমতুল্য মনে করেন? তিনি বলেন, হাঁ"।[১২]

عَنْ صُهَيْبُ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ « أَيُّمَا رَجُلٍ يَدَيَّنُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لاَ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا .

সুহাইব আল-খাইর (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি ঋণ করার পর সংকল্প করে যে, সে তা পরিশোধ করবে না, সে আল্লাহর নিকট চোর

---

১০. মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাতি ওয়াল মযারাআতি, বাব: ফাদলু ইনযারিল মু'সিরি ওয়াত-তাজাউযি ফিল ইকতিযায়ি মিনাল মুসিরি ওয়াল মু'সির, নং ৪০৮০

১১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, নং ৪৮৫২

১২. নাসাঈ, কিতাবুল ইসিতি'আযাহ, বাব: আল-ইসতি'আযাতু মিনাদ-দাইন, নং ৫৪৯১

হিসেবে সাক্ষাৎ করবে" ।[১৩]

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: الدين راية الله في الأرض، فإذا أراد الله أن يذل عبدا وضعه في عنقه"

ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেন, "ঋণ হলো পৃথিবীতে আল্লাহর পতাকা। অতএব আল্লাহ যখন তার কোনো বান্দাকে অপদস্থ করতে চান তখন তার গলায় তা পরিয়ে দেন" ।[১৪]

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِىَّ يَقُولُ رَسُولِ اللَّهِ –ﷺ– أَنَّهُ قَالَ « إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ – بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِى نَهَى اللَّهُ عَنْهَا – أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَدَعُ لَهُ قَضَاءً.

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কবীরা গুনাহসমূহের পর আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো, কোনো ব্যক্তি এমন ঋণ নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে যে, যা পরিশোধের সে কোনো ব্যবস্থা করে যায়নি" ।[১৫]

عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ –ﷺ–« فِى الدَّيْنِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَقْضِىَ دَيْنَهُ ».

মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন জাহ্শ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি: "ঐ মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদ (স.) এর জীবন! কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে পুনরায় (দুনিয়ার) জীবন লাভ করে,আবার শহীদ হয়ে পুনরায় (দুনিয়ার) জীবন লাভ করে,আবার শহীদ হয়ে পুনরায় (দুনিয়ার) জীবন লাভ করে এবং তার যিম্মায় যদি ঋণ থাকে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যদি না সে তা পরিশোধ করে" ।[১৬]

মহানবী (স.) রহমাতুল লিল আলামীন হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরিত হওয়া সত্ত্বেও ঐ ঋণ অনাদায়ীদের জানাযা পড়তেন না, যে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে যায়নি। ঋণ অনাদায়কে তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাবে নিরুৎসাহিত করতেন। এবিষয়ে হাদীসে ব্যাপক নির্দেশনা রয়েছে। যেমন-

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أُتِىَ بِجَنَازَةٍ ، لِيُصَلِّىَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ . قَالُوا لاَ . فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أُتِىَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى ، فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مَنْ دَيْنٍ . قَالُوا نَعَمْ .

---

১৩. ইবন মাজাহ, কিতাবুল হেবাত, বাব: মান আদ্দানা দাইনান লাম ইয়ানয়ি কাযাউহু, নং ২৫০২

১৪. কানযুল উম্মাল, নং ১০৪৭৮

১৫. আবূ দাউদ, কিতাবুল বুয়ূ, বাব : ফিত-তাশদীদি ফিদ-দাইন, নং ৩৩৪৪

১৬. আহমাদ, আল-মুসনাদ, নং ২৩১৫৬

قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ . قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَىَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَصَلَّى عَلَيْهِ .

সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। "একদা নবী (স.) এর নিকট একটি লাশ নিয়ে আসা হলে তিনি বলেন, তার কি কোনো ঋণ আছে? তারা বললো, না। তখন তিনি তার জানাযা পড়ালেন। অতঃপর আরেকটি লাশ আনা হলে বলেন, তার কি কোনো ঋণ আছে? তারা বললো, হাঁ। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের এ সাথীর জানাযা পড়ে নাও। আবূ কাতাদা (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার ঋণের দায় আমার ওপর। অতঃপর তিনি জানাযা পড়লেন"।[১৭]

পাওনাদারের সাথে ঋণদাতার কঠোর আচরণ করার অধিকার রয়েছে। মহানবী (স.) এর বেলায়ও এরূপ ঘটনা ঘটেছে এবং তিনি উত্তম বস্তুরাজি দ্বারা পাওনা পরিশোধ করতেন। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَغْلَظَ لَهُ ، فَهَمَّ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً . وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ . وَقَالُوا لاَ نَجِدُ إِلاَّ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ . قَالَ اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً .

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে তাগাদা দিলো এবং তাঁর সাথে রূঢ় ব্যবহার করলো। তাঁর সাহাবীগণ তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য উদ্যত হলো। তখন তিনি বলেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা পাওনাদারের কথা বলার অধিকার রয়েছে। তোমরা তার জন্য একটি উট কিনো এবং তা তাকে দিয়ে দাও। তারা বললো, আমরা সেটির সমবয়সের উট পাচ্ছি না, বরং তার চেয়ে উত্তম উট পাচ্ছি। তিনি বলেন, ওটিই কিনো এবং তাকে দিয়ে দাও। কেননা তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে উত্তম রূপে তার পাওনা পরিশোধ করে"।[১৮]

ঋণ আদায়ে সামর্থ্যবান ব্যক্তির ঋণ আদায়ে গড়িমসি অগ্রহণযোগ্য

সমাজে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী এমনও আছে যারা রাষ্ট্রের আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যবসায়ের কথা বলে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে কিন্তু যথাসময়ে তা পরিশোধ করে না। তারা বড়ো বড়ো রাজনৈতিক দলের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে তা পরিশোধের ধার ধারে না। তারা ঋণখেলাফী নামে পরিচিত। এ ধরনের আচরণ নিঃসন্দেহে যুলুম এবং জাতির সাথে মস্কারার শামিল। হাদীসে এধরনের কাজকে যুলুম বলা হয়েছে। যেমন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – ﷺ – قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ.

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "ধনী (সচ্ছল) ব্যক্তির ঋণ

---

১৭. বুখারী, কিতাবুল কাফালা, বাব: মান তাকাফ্ফালা আন মায়্যিতিন দাইনান..., নং ২২৯৫

১৮. বুখারী, কিতাবু ফিল ইসতিকরাযি ওয়া আদায়িদ দুয়ূনি ওয়াল হাজরি ওয়াত-তাফলীস, বাব: ইসতিকরাযুল ইবল, নং ২৩৯০

পরিশোধে গড়িমসি করা যুলুম। কাজেই তোমাদের কোনো ব্যক্তিকে ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হলে সে যেনো তা মেনে নেয়"।[১৯]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ –ﷺ– قَالَ وَالثَّلاَثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ.

আবূ যার (রা.) সূত্রে নবী (স.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ..."মহান আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন। তারা হলো: (ক) বৃদ্ধ ব্যভিচারী, (খ) দরিদ্র অহংকারী এবং (গ) জালিম সচ্ছল ব্যক্তি"।[২০]

عَنْ ثَوْبَانَ – مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ –ﷺ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –ﷺ– أَنَّهُ قَالَ « مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِىءٌ مِنْ ثَلاَثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ.

রাসূলুল্লাহ (স.) এর মুক্তদাস সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, যে ব্যক্তির আত্মা তিনটি কাজ থেকে মুক্ত অবস্থায় বের হবে সেই কেবল জান্নাতে প্রবেশ করবে: (১) অহংকার, (২) আত্মসাৎ ও (৩) ঋণ"।[২১]

[عَنِ الْقَاسِمِ، مَوْلَى مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا قَالَ: " مَنْ تَدَيَّنَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهُ، حَرِيصٌ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ، مَاتَ وَلَمْ يَقْضِ دَيْنَهُ، فَإِنَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُرْضِيَ غَرِيمَهُ بِمَا شَاءَ مِنْ عِنْدِهِ، وَيَغْفِرُ لِلْمُتَوَفَّى، وَمَنْ تَدَيَّنَ بِدَيْنٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهُ فَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُقْضَ دِينُهُ، فَإِنَّهُ يُقَالُ لَهُ: ظَنَنْتَ أَنَّا لَا نُوَفِّي فُلَانًا حَقَّهُ مِنْكَ، فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَتُجْعَلُ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِ رَبِّ الدَّيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ رَبِّ الدَّيْنِ فَجُعِلَتْ فِي سَيِّئَاتِ الْمَطْلُوبِ. "

মু'আবিয়া (রা.)–এর মুক্তদাস আল-কাসিম (র.) থেকে বর্ণিত। তার নিকট এই হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি পরিশোধের ইচ্ছা নিয়ে ঋণ করলো এবং তা আদায়ে আগ্রহীও ছিলো কিন্তু আদায় করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করলো,আল্লাহ তার পাওনাদারকে যা ইচ্ছে তা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে এবং ঋণগ্রহীতাকে ক্ষমা করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পরিশোধ না করার ইচ্ছা নিয়ে ঋণ করলো এবং তা আদায়ে আগ্রহীও ছিলো না আর সে তা পরিশোধ করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করলো,তাকে বলা হবে,আমি তোমার পক্ষে অমুকের পাওনা পরিশোধ করবো না। অতঃপর তার নেক আমল থেকে কিছু নেক নিয়ে পাওনাদারকে দিয়ে দেয়া হবে। তার নেক আমল না থাকলে পাওনাদারের পাপরাশি থেকে কিছু পাপ তার আমলের সাথে জুড়ে দেয়া হবে"।[২২]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَىَّ وَإِلَىَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ .

---

১৯. বুখারী, কিতাবুল হাওয়ালাত, বাব: আল-হাওয়ালা, ওয়া হাল ইয়ারজাউ ফিল-হাওলাতি, নং ২২৮৭

২০. নাসাঈ, কিতাবুয যাকাত, বাব: সাওয়াবু মান ইউতি, নং ২৫৮২

২১. ইবন মাজাহ, কিতাবুল হেবাত, বাব: আত-তাশদীদু ফিদ-দাইন, নং ২৫০৫

২২. আল-বায়হাকী,শু'আবুল ঈমান, নং ৫১৭২

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "কোনো ব্যক্তি সম্পদ রেখে মারা গেলে তা তার ওয়ারিসের প্রাপ্য। আর কোনো ব্যক্তি ঋণ অথবা অসহায় সন্তান-সন্ততি রেখে মারা গেলে তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার। আর আমিই মুমিনদের উত্তম অভিভাবক"।[২৩]

মাহর এক ধরনের ঋণ। কোনো ব্যক্তি তা আদায়ের নিয়াত না রাখলে তা হবে ব্যভিচারের অপরাধের সমতুল্য। হাদীসে এসেছে,

عَنْ صُهَيْب الْخَيْرِ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : أيما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى أن لا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت هو خائن والخائن في النار

সুহাইব আল-খাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি: "কোনো ব্যক্তি এক মহিলাকে বিয়ে করলো এবং সে নিয়াত করলো যে, সে তাকে মাহর দিবে না। এরপর সে মাহর আদায় না করেই মারা গেলো। সে প্রকৃতপক্ষে ব্যভিচারী হিসেবে মারা গেলো। যে ব্যক্তি কারো নিকট থেকে কিছু কিনলো এবং সংকল্প করলো যে, ক্রয়কৃত বস্তুর মূল্য পরিশোধ করবে না। সে মূলত প্রতারক রূপে মারা গেলো। আর প্রতারক জাহান্নামে প্রবেশ করবে"।[২৪]

কিয়ামতের দিন ঋণ খাতকের বিরুদ্ধে মামলা করবে

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ– إِنَّ الدَّيْنَ يُقْضَى مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا مَاتَ إِلاَّ مَنْ يَدَيَّنُ فِى ثَلاَثِ خِلاَلٍ الرَّجُلُ تَضْعُفُ قُوَّتُهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَيَسْتَدِينُ يَتَقَوَّى بِهِ لِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوِّهِ وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ لاَ يَجِدُ مَا يُكَفِّنُهُ وَيُوَارِيهِ إِلاَّ بِدَيْنٍ وَرَجُلٌ خَافَ اللَّهَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزْبَةَ فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلَى دِينِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْضِى عَنْ هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন ঋণ বিচার প্রার্থনা করবে। তবে তিনটি কারণে ঋণ করলে ভিন্ন কথা : (১) কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে দুর্বল হয়ে পড়লো। অতঃপর সে আল্লাহর শত্রু ও তার নিজ শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশে ঋণ করলে; (২) কোনো মুসলিম মারা গেলো কিন্তু তার কাফন ও লজ্জা নিবারণের মতো প্রয়োজনীয় কাপড় নেই, এমতাবস্থায় তার জন্য ঋণ করলে এবং (গ) কোনো ব্যক্তি একাকীত্বকে নিজের জন্য আশংকাজনক মনে করলো এবং দীন হেফাযতের জন্য (ঋণ করে) বিয়ে করলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কিয়ামতের দিন এসব ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন"।[২৫]

---

২৩. ইবন মাজাহ, কিতাবুল হেবাত, বাব: মান তারাকা দাইনান আও যিয়াআন ফা-আল্লালাহি ওয়া রাসূলিহি, নং ২৫০৫

২৪. আত-তাবারানী, আল-কাবীর, নং ৭৩০২

২৫. ইবন মাজাহ , আবওয়াবুস সাদাকাত, বাব: ছালাছু মান আদ্দানা ফীহিন্না কাযাল্লাহু আনহু, নং ২৫২৯/২১

عن خولة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها الحق من قويها غير متعتع ثم قال : من انصرف غنيمه من حقه هذه وهو راض عنه صلت عليه دواب الأرض ونون الماء ومن انصرف غريمه وهو ساخط كتب عليه في كل يوم وليلة وجمعة وشهر ظلم`

খাওলা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: "মহান আল্লাহ ঐ জাতিকে পবিত্র করেন না, যে জাতির দুর্বল লোকজন তাদের শক্তিধরদের থেকে নিজেদের অধিকার আদায় করতে পারে না। এরপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তির পাওনাদার তার নিকট থেকে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে যায়,পৃথিবীর সকল প্রাণী ও পানির মাছ তাকে দু'আ করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির পাওনাদার তার নিকট থেকে অসন্তুষ্ট অবস্থায় ফিরে যায়, তার আমলনামায় প্রতিদিন ও প্রতিরাতে, প্রতি জুমু'আয়, প্রতি সপ্তাহে ও প্রতি মাসে যুলুমের পাপ লেখা হয়।[২৬]

হাদীসের শিক্ষা

অত্র দারসুল হাদীসে ঋণদানের সাওয়াব এবং তা পরিশোধের ব্যাপারে কঠোরতা সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। আমাদের সমাজের চিত্র হচ্ছে, অভাবগ্রস্ত লোকজন একান্ত প্রয়োজনে ধনীদের নিকট ঋণের জন্য ধর্না দেয়,কিন্তু ধনীরা ঋণ না দেয়ায় তারা বাধ্য হয়ে সুদে ঋণ নেয়। অপরদিকে কিছু লোক এমনও পাওয়া যায়, যারা ঋণ করে গা ঢাকা দেয়, ঋণ পরিশোধ করে না;এতদুভয় কাজই নিন্দনীয়। এমতাবস্থায় ঋণদাতা ও গ্রহীতাকে ইসলামের নির্দেশনা মানার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে। সম্মানিত পাঠক! আমরা অত্র দারসুল হাদীস থেকে নিম্নোক্ত শিক্ষা লাভ করতে পারি-

(১) অভাবী লোককে ঋণ দিতে ইসলামী শরী'আ উৎসাহিত করে।
(২) ইসলামী শরী'আ ঋণ করতে নিরুৎসাহিত করে।
(৩) সচ্ছল ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা ঘোরতর অপরাধ।
(৪) মহান আল্লাহ ঋণের দায় ক্ষমা করেন না।
(৫) কারো ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আদায়ে অপরাগ হলে আল্লাহ তার যিম্মাদারী গ্রহণ করেন।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে ঋণ থেকে হেফাযত রাখুন। আমীন। ■

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

২৬. আত-তাবারানী, আল-কাবীর, নং ৫৯১

মুক্তিযুদ্ধ-'৭১
পঁচিশ-পূর্ব সংলাপের অন্তরাল-কাহিনী

আবুল আসাদ

১৫ মার্চ, ১৯৭১ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা আসার পর ২৫ মার্চের কালরাত পর্যন্ত 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, শেখ মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যে কী নিয়ে কী ধরনের আলোচনা হয়েছিল, তাতে কার কী ভূমিকা ছিল, তা পরে অনেকের কাছ থেকেই জানা গেছে। সেসব আলোচনা সামনে আসলে সে ঐতিহাসিক সময়ের একটা চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমে সেই সময়ের ঘটনার একজন ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষক জনাব মওদুদ আহমদ যে বিবরণ দিয়েছেন, সেটা দেখা যাক। Bangladesh Constitutional Quest for Autonomy গ্রন্থে তিনি লিখেছেনঃ

"রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া তার কতিপয় জেনারেলকে সাথে নিয়ে ১৫ মার্চ ঢাকা এলেন। ১৬ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে কথাবার্তা চলল। পরে এর সাথে ভুট্টো এসেও যুক্ত হলেন। ইয়াহিয়া আগের মতোই মুজিবের প্রতি আপসমূলক আচরণ প্রদর্শন করলেন। এ পর্যন্ত যা ঘটেছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং রাজনৈতিক সমাধানের তার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার কথা জানালেন। এবার আলোচনার বিষয়বস্তু ১লা মার্চের আগের আলোচনা থেকে আলাদা হলো। এবারের আলোচনা পূর্ণ একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দিকে না গিয়ে জন প্রতিনিধিদের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রকৃতি কেমন হবে, তার ওপরই কেন্দ্রীভূত থাকল। এটা ছিল জন-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সুযোগ সৃষ্টির জন্য একটা অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা ঠিক করার প্রশ্ন। শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ ও ফেডারেল সরকারের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের প্রশ্নও এর সাথে জড়িত ছিল। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য মুজিব ও ইয়াহিয়া নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেন-

১. সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং একটি প্রেসিডেন্সিয়াল প্রক্লামেশন মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।
২. প্রাদেশিক ক্ষমতা সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের হাতে অর্পণ।
৩. ইয়াহিয়ার হাতে প্রেসিডেন্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব থাকবে।
৪. পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্যদের প্রথম প্রস্তুতিমূলক বৈঠক এবং তারপর শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত প্রণয়নের জন্য জাতীয় পরিষদে যুক্ত অধিবেশন।

চতুর্থ প্রস্তাবটি শেখ মুজিব নিজেই দিয়েছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তা অনুমোদন করেছিলেন। তাজউদ্দীন তার ১৭ এপ্রিল, ৭১ তারিখের বিবৃতিতে উল্লেখ করেছিলেন যে, ভুট্টোকে এ্যাকোমোডেট করা এ সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকে এবং ফেডারেল গভর্নমেন্টকে তাদের অবস্থান নিরূপণে সুযোগ দেওয়ার জন্য ইয়াহিয়া নিজেই এর প্রস্তাব

করেছিলেন। কারণ ৬ দফা পুরোপুরি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর জন্য প্রযোজ্য ছিল না। পিপলস পার্টি প্রস্তাব করেছিল, জাতীয় পরিষদ প্রথমে একক বডি হিসেবে অধিবেশনে মিলিত হবে, তারপর দুটি কমিটি গঠন করবে। মুজিব এ প্রস্তাব ভুট্টোকে এ্যাকোমোডেট করার জন্য গ্রহণ করেছিলেন।

মুজিবের এ-ই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আন্দোলনের প্রকৃতি দেখে তিনি তার কৌশল পরিবর্তন করেছিলেন। মুজিব আগে যা জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে চেয়েছিলেন, এখন তিনি তা পেতে চাইলেন ইয়াহিয়ার দ্বারা ঘোষিত একটি অন্তবর্তীকালীন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে। যেহেতু শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য জাতীয় পরিষদ বসতে পারছিল না এবং যেহেতু ভুট্টো এবং সেনাবাহিনী আওয়ামী লীগ কর্তৃক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের বিরোধী ছিল, তাই মুজিবের এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। তিনি এখন প্রথমেই প্রদেশগুলো বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের হাতে ৬ দফার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের এখতিয়ারসহ ক্ষমতা হস্তান্তর চাইলেন। এর দ্বারা তিনি জনগণকে শান্ত করতে পারবেন এবং একবার পরিস্থিতি ঠান্ডা হয়ে গেলেই জাতীয় পরিষদে তিনি পাকিস্তানের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারবেন।

১৬ মার্চ মুজিব যখন ইয়াহিয়ার কাছে তার চার দফা দাবি পেশ করলেন, তখন ইয়াহিয়া মুজিবকে কেন্দ্রে ভুট্টোর সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে বললেন। প্রস্তাবটি খুব মন্দ ছিল না এবং মুজিব নীতিগতভাবে কেন্দ্রে এ ধরনের সরকার গঠনের বিরোধিতা করলেন না। কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন, গণতান্ত্রিক বিধি অনুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে তাকে মন্ত্রী পছন্দ করার ক্ষেত্রে চাপ দেওয়া যাবে না। মুজিবের প্রতিক্রিয়া দেখার পর ইয়াহিয়া বোধগম্য কারণেই এ পথে আর অগ্রসর হননি।

মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যকার ১৭ ও ১৮ মার্চের আলোচনা ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের তৃতীয় শিডিউল ঘিরেই কেন্দ্রীভূত ছিল। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের আইনগত ক্ষমতা নির্ধারণ নিয়েই তাদের আলোচনা চলছিল। ইয়াহিয়ার উপদেষ্টারা মত প্রকাশ করছিলেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের অধীনেই প্রদেশগুলো পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। আওয়ামী লীগ এ প্রস্তাব সরাসরি বাতিল করে দিলো।

ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা আরও বলেন, সামরিক বিধির অধীনে ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু আওয়ামী লীগের দাবির প্রথমটিই ছিল সামরিক আইন প্রত্যাহার, তাই এ প্রস্তাবের আওয়ামী লীগ বিরোধিতা করল। ১৯ মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া আবার বৈঠক হলো। বৈঠকে ইয়াহিয়া স্বীকার করলেন, প্রেসিডেন্সিয়াল অধ্যাদেশের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি আছেন। তারা আরও একমত হলেন, ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের যথেষ্ট আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকা দরকার। ১৯ মার্চের বৈঠকের পর মুজিব খুবই আশান্বিত হলেন এবং তিনি আমাকে বললেন যে, ইয়াহিয়া ৬ দফা এমনকি এরও বেশি কনফেডারেশন পর্যন্ত মানতে রাজি আছেন। আলোচনার মধ্য দিয়ে সমস্যার অবশেষে সমাধান হতে যাচ্ছে। সংবাদপত্র এবং অন্যান্য মাধ্যমও আশাবাদ প্রকাশ করল এবং জনগণও পুনরায় আশান্বিত হয়ে উঠল। ওই দিন সন্ধ্যায় আমি শেখ মুজিবকে জিজ্ঞেস

করলাম, হঠাৎ করে সেনাবাহিনীর এ বোধোদয় হলো কেমন করে? মুজিব উত্তরে বললেন- পূর্ব পাকিস্তানের জনমতের মোকাবিলায় তাদের আর কোনো বিকল্প ছিল না। তারা জানে, এ না হলে তারা পূর্ব পাকিস্তান হারাবে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের অস্তিত্ব থাকবে না।

ইয়াহিয়া ও মুজিবের মধ্যকার সমঝোতা অনুসারে ইয়াহিয়ার উপদেষ্টারা একটা খসড়া প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণা তৈরি করলেন, মার্শাল-ল' রেগুলেশনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে বিরোধিতা আওয়ামীলীগ করছিল তা এর দ্বারা পূরণের ব্যবস্থা করা হলো। এ খসড়া ঘোষণা তৈরির লক্ষ্য ছিল জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যাসমূহ আলোচনার ভিত্তি তৈরি করা। খসড়া ঘোষণাটি কমবেশি ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রকে বিবেচনায় রেখেই প্রণীত হয়েছিল। এতে প্রেসিডেন্ট এবং কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের মতোই রইল। অবশ্য খসড়া দলিলটির ৭ নং আইটেমে পূর্ব পাকিস্তানের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হলো: "কেন্দ্রীয় আইনসভা পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সম্মত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া থার্ড শিডিউল অনুসারে আইন প্রণয়নের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করবে।"

শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এ খসড়া ঘোষণাপত্রে খুবই হতাশ হলেন। অন্তত আইন প্রণয়নের দিক দিয়ে তাদের ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের পর্যায়ে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা একে সামরিক জান্তার কালক্ষেপণকারী কৌশল বলে মনে করলেন। মুজিব খুবই ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাদের প্রকৃত মতলবটা জানতে চাইলেন। তিনি এবং তাজউদ্দীন পরদিন (২১ মার্চ) সকালে ইয়াহিয়ার সাথে এক অনির্ধারিত সাক্ষাৎকারে মিলিত হলেন এবং জানতে চাইলেন তিনি (ইয়াহিয়া) সত্যিই কোনো রাজনৈতিক সমাধান চান কি না। বাইরের বিস্ফোরণমুখ অবস্থার কথা, যেখানে মানুষ স্বাধীনতার দাবি তুলেছে, তারা ইয়াহিয়াকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, তারা অনির্দিষ্টকাল এ আলোচনা চালিয়ে যেতে পারবেন না। ইয়াহিয়া তাড়াতাড়ি মুজিবকে শান্ত করলেন এবং বললেন, তিনি মুজিবের শাসনতান্ত্রিক ফরমুলার সাথে একমত। ইয়াহিয়া মুজিবকে জানালেন যে, ঘোষণা চূড়ান্ত করার আগে আমাদের ঐকমত্যের ব্যাপারটা ভুট্টোকে অবহিত করার জন্য তাকে আমি ঢাকা আসতে বলেছি।

ঐকমত্য অনুসারে ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা (legislative powers) সুনির্দিষ্ট করে একটি প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণা আওয়ামী লীগ তৈরি করে দাখিল করল। ঘোষণার প্রস্তাবনায় বলা হলো। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজনেই এটা প্রণীত। আওয়ামী লীগ প্রস্তাবিত এ খসড়ায় প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারটা ১৯৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের কাছে পেশকৃত Constitution Amendment Bill-এর অনুরূপ ছিল। এ খসড়া ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের "স্টেস্ট অব বাংলাদেশ" নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছিল। এটা নতুন কোনো বিষয় ছিল না। ১৯৬৯ সালের শাসনতন্ত্র সংশোধন বিলের ২(৫) ধারায় প্রদেশগুলোকে শাসনতান্ত্রিকভাবে এ ক্ষমতা

দেওয়া হয়েছিল যে, যে নামে সে পরিচিত তা গ্রহণ করতে পারে। আওয়ামী লীগের খসড়া ঘোষণায় রাষ্ট্রের নাম ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান অক্ষুন্ন রাখা হলো এবং বলা হলো ঘোষণায় (Proclamation) গৃহীত সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধন সাপেক্ষে পাকিস্তান ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে পরিচালিত হবে। ইয়াহিয়া পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন সে সুযোগ ঘোষণাটিতে রাখা হলো। ঘোষণার বিধান সাপেক্ষে প্রেসিডেন্ট প্রশাসনিক হেড হিসেবে সাবেক শাসনতন্ত্রের সব ক্ষমতা ভোগ করবেন। তিনি প্রয়োজন অনুসারে উপদেষ্টা, ইত্যাদি ধরনের স্টাফ নিয়োগ করতে পারবেন। তবে তিনি জাতীয় পরিষদ কিংবা স্টেট এসেম্বলী বাতিল বা স্থগিত করতে পারবেন না। কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর মধ্যে বিষয় বণ্টনের মতো মৌল বিষয়ে বলা হলো, ফেডারেল আইন পরিষদ পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) ব্যাপারে ১২টি বিষয়ে আইন প্রণয়ন একক ক্ষমতা ভোগ করবে। বিষয়গুলো হলো:

ক. Defense of Pakistan.
খ. Foreign Affairs, excluding Foreign Trade and Aid.
গ. Citizenship, naturalization and aliens, including admission of persons into and departure of persons from Pakistan.
ঘ. Currency, coinage, legal tender and the state Bank of Pakistan subject to paragraph 16 of the proclamation.
ঙ. Public Debt of the Centre.
চ. Standards and weight and measures.
ছ. Property of the Centre, wherever situated and the revenue from such property.
জ. Coordination of international and inter-wing Communication.
ঝ. Flections to the office of the President, to the national Assembly and to the Provincial Assemblies, the Chief Election Commissioner and Election Commissioners, remuneration of the Speaker, Deputy Speaker, and other members of the National Assembly, powers, privileges and immunities of the National Assembly.
ঞ. Supreme Court of Pakistan. The Service and Execution outside a province or a State of Processes and judgements.
ট. Offences against laws with respect to any of the matters enumerated above.

১৯৭১ সালে আগস্টে প্রকাশিত শ্বেতপত্রে পাকিস্তান সরকার অভিযোগ করল যে, মুজিবের খসড়া ঘোষণাটি পাকিস্তানকে কনফেডারেশনে পরিণত করতে চাচ্ছিল। কারণ এতে ছিল দুই শাসনতান্ত্রিক কনভেনশনের কথা-একটি পূর্ব পাকিস্তান, অপরটি পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। যা ছিল একই সাথে "লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক এবং আওয়ামী লীগের ছয় দফার

বিরোধী। এ কারণেই সামরিক জান্তার কাছে তা ছিল অগ্রহণযোগ্য।" যদিও ওই পরামর্শটা এসেছিল ভুট্টোকে স্থান করে দেওয়ার চিন্তা থেকে, তবু বিরাজমান অবস্থার আলোকে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা চলতে পারত। কেউ একে "ফেডারেশন" বলুক কিংবা "কনফেডারেশন" মুজিব এর দ্বারা চেয়েছিলেন রাজনৈতিক সমাধানের একটা পথ খুঁজতে। একটি কনফেডারেশনের রূপ যদি হয় "স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশসমূহের একটি ইউনিয়ন", তাহলে আওয়ামী লীগ প্রস্তাবিত খসড়া ঘোষণায় রাষ্ট্রের যে রূপ তুলে ধরা হয়েছিল তাকে সত্যিকার অর্থে কনফেডারেশন বলা যাবে না। যদিও সময়টা এমনই উত্তপ্ত ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের তরফ থেকে কনফেডারেশন, যার কথা জান্তা বলেছে, এর দাবি ওঠা অসম্ভব কিছু ছিল না, তবু আওয়ামী লীগ কেন্দ্রের হাতে সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষমতা রেখে এক সার্বভৌম পাকিস্তানের প্রস্তাব তার খসড়া ঘোষণায় রেখেছিল। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিলের বিবৃতিতে তাজউদ্দীন বলছিলেন, আওয়ামী লীগ প্রস্তাবিত খসড়া ঘোষণায় এম. এম. আহমদ তিনটি সংশোধনী এনেছিলেন যা আওয়ামী লীগ ভাষার সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে গ্রহণ করেছিল। এ ঐকমত্যের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ আশা করছিল যে, খসড়া ঘোষণাটির ভিত্তিতে তাদের অন্তবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

ইয়াহিয়া মুজিবের ঐকমত্য যা বলেছে তা হলো সামরিক শাসন তুলে নেওয়া হবে, জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে এবং অন্তবর্তীকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তান পর্যাপ্ত স্বায়ত্বশাসন ভোগ করবে। ভুট্টো ঢাকা এলেন মার্চের ২১ তারিখে। সেই দিনই প্রেসিডেন্টের সাথে তিনি দেখা করলেন। প্রেসিডেন্ট তাকে মুজিব-ইয়াহিয়া ঐকমত্যের বিষয়টা পূর্ণভাবে অবহিত করলেন। পরদিন একটি যৌথ বৈঠক ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে ইয়াহিয়ার এ আশ্বাসের ভিত্তিতে মুজিব একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে উপস্থিত হলেন যেখানে ইয়াহিয়া, মুজিব ও ভুট্টোই শুধু ছিলেন। এ বৈঠকে ভুট্টো কেন্দ্রে দুই মেজরিটি পার্টির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে আগ্রহ প্রকাশ করলেন, তিনি বললেন, কোনো শাসনতন্ত্রই জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের মেজরিটি অর্থাৎ পিপলস পার্টির অনুমোদন ছাড়া গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ভুট্টো দাবি করলেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তর এবং শাসনতন্ত্র তৈরি উভয় ক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিট হিসেবে ধরতে হবে। ভুট্টোর এ দাবিগুলোর কোনোটিই মুজিবের জন্য গ্রহণযোগ্য ছিল না। মুজিব কেন্দ্রে সরকার গঠনের আশা ত্যাগই করে বসেছিলেন। কিন্তু ভুট্টোকে একটা স্থান করে দেওয়ার জন্যই তিনি অবশেষে এ আপস ব্যাবস্থায় রাজি হলেন যে, অন্তবর্তীকালীন সময়ে জাতীয় পরিষদ পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত হবে যাতে করে পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর ভুট্টোর কর্তৃত্ব থাকে।

ভুট্টো খুশি হলেন যে, মুজিব অন্তত জাতীয় পরিষদকে দুই ভাগে ভাগ করতে রাজি হয়েছেন। এটা পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা হিসেবে ভুট্টোর প্রতি স্বীকৃতিই শুধু নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যদের সমর্থন নিয়ে ৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অবস্থান থেকেও মুজিবকে এটা সরিয়ে আনল। জাতীয় পরিষদ এক হিসেবে বসবে না দুই, না কমিটিসমূহের আকারে বসবে, মুজিবের জন্য এটা কোনো ব্যাপারই ছিল না। তার দল সংখ্যাগরিষ্ঠ। জাতীয় পরিষদ যখনই একক অধিবেশনে বসবে তিনি গোটা দেশের জন্য

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকারী। কিন্তু ভুট্টোকে এ স্বীকৃতি দেওয়ার বিনিময়ে মুজিব যেটা চেয়েছিলেন তা হলো, পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং পূর্ব পাকিস্তানের পর্যাপ্ত স্বায়ত্তশাসনের শাসনতান্ত্রিক নিশ্চয়তা। এ ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের পর ভুট্টো একে "ফলপ্রসূ ও সন্তোষজনক" বলে অভিহিত করলেন।

এবং জনগণকে এ ধারণা দেওয়া হলো যে, সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে। এ বৈঠকে ২৫ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠাতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৩ ও ২৪ মার্চ যখন ইয়াহিয়া ও মুজিবের উপদেষ্টাদের মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রস্তাবিত খসড়া ঘোষণা অনুসারে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিস্তারিত আলোচনা চলছিল, তখন ভুট্টো অন্তবর্তীকালীন পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানকে বাড়তি কোনো অধিকার দেওয়ার বিরোধিতা অব্যাহত রাখেন এবং ফেডারেল তালিকা থেকে "ফরেন এইড 'ও ফরেন ট্রেড" বাদ রাখার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি উত্থাপন করেন। তিনি আরও মতপ্রকাশ করলেন, সামরিক শাসনের উপস্থিতি ছাড়া প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর আইন বিরুদ্ধ হবে। এরূপ ঘোষণার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হলে। কেন্দ্রীয় সরকার বলতে কিছু থাকবে না।

জেনারেল পীরজাদা এবং অন্যান্য সহ প্রেসিডেন্টের অথনৈতিক উপদেষ্টা মি. এম. এম. আহমদ বৈঠকগুলোতে হাজির ছিলেন এবং খসড়া ঘোষণার বিস্তারিত আলোচনা করেন। ইয়াহিয়া ও মুজিবের উপদেষ্টাদের মধ্যে শেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২৪ মার্চ' বিকেলে। সেই পুরাতন বিষয় পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণ প্রশ্নেই এ বৈঠক মূলতবি হয়ে যায়। শেখ মুজিবের উপদেষ্টারা যখন প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে ফিরলেন তাদের খুব মলিন মনে হলো এবং তাজউদ্দীন আমাকে বললেন- "তারা তাদের সিদ্ধান্ত আমাদের আগামীকাল (২৫ মার্চ) জানাবে।" যাহোক, গোটা বিষয়টাকেই অর্থহীন প্রয়াস মনে হলো। ২৪ মার্চ বিকেল পর্যন্ত, সরকারিভাবে আলোচনা চলছিলই, পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটল। ভুট্টো বাদে পিপলস পার্টির সব নেতাসহ পশ্চিম পাকিস্তানের সকল নেতাই ঢাকা ত্যাগ করলেন। কোনো একটা পরিকল্পনা যেন কার্যকর হতে যাচ্ছে এবং এ নেতৃবৃন্দ যেন সেনাবাহিনীর সে পরিকল্পনা জানতে পেরেছেন, তাদের ঢাকা ত্যাগকে তারই লক্ষণ বলে মনে হলো। ২৫ মার্চ বেলা ৯টায় ভুট্টো ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করলেন এবং ইয়াহিয়া ও মুজিবের উপদেষ্টারা যে শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছিলেন তার প্রতি চূড়ান্তভাবে তার "না" টা জানিয়ে দিলেন। যদিও প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনার পর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় তিনি দাবি করলেন- "আমরা কোনো সমস্যা সৃষ্টি করছি না, তবু ভুট্টো বললেন, পূর্ব পাকিস্তান যে স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছে তা স্বায়ত্তশাসনের সংজ্ঞার বিচারে সত্যিই স্বায়ত্তশাসন নয়।"

ওই দিন (২৫ মার্চ) সকালেই ১০টার দিকে আমি ক্ষমতাসীন জেনারেলদের শেভ্রলেট কারের একটি কনভয়কে প্রেসিডেন্ট ভবনে ঢুকতে দেখলাম। জেনারেল হামিদ, ওমার, মিঠা, পীরজাদা এবং টিক্কা ইয়াহিয়ার সাথে একটি ভাগ্য নির্ধারণী বৈঠকে বসলেন যা চলল মাত্র ৩০ মিনিট। ফল হলো এই, ইয়াহিয়া ও মুজিবের উপদেষ্টাদের শাসনতান্ত্রিক

আলোচনার যে রেজাল্ট আওয়ামী লীগকে জানানোর কথা ছিল, তা আর কোনো দিনই জানানো হলো না। ২৫ মার্চ বিকেলে মুজিব ক্যান্টনমেন্টে সোর্সে জানতে পারলেন যে, রাজনৈতিক সমাধানের কোনো সম্ভাবনা নেই এবং সেনাবাহিনী তার অভিযানের জন্য তৈরি হচ্ছে। বিকেলে ওই একই উৎস থেকে মুজিবকে বলা হলো, ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেছেন। সেনাবাহিনীর আসন্ন অভিযানের রকম প্রকৃতি শেখ মুজিব অনুমান করতে পারলেন না। তিনি তার চারদিকের সহকর্মীদের তৎক্ষণাৎ ঢাকা শহর থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তোফায়েল, রাজ্জাক প্রমুখ যুব নেতাদের বুড়িগঙ্গার ওপারে গ্রামাঞ্চলে সরে যেতে বললেন।

রাত সাড়ে দশটার দিকে একটা সেনা ইউনিট রেডিও ও টিভি স্টেশনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল এবং সাড়ে এগারোটা থেকে ব্যাপক আকারে গোলাগুলি শুরু হলো। মুজিব বাড়িতে থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাজউদ্দীন ও আমি কয়েকজন বন্ধু সমেত হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আটকা পড়েছিলাম। বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতিশীল সব বিদেশি সংবাদদাতারাও সেখানে অবস্থান করছিলেন। তারাও আটকা পড়লেন। ভুট্টো ১১০০নং স্যুটে অবস্থান করছিলেন। রাত সাড়ে ১২টার দিকে সেনাবাহিনীর ৫৮ থেকে ৬০টি গাড়ির একটা বহর প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে বেরিয়ে আমাদের হোটেল অতিক্রম করে বাঁ দিকে ঘুরে শাহবাগের দিকে চলে গেল। সাথে সাথেই আমি হোটেল থেকে মুজিবের কাছে টেলিফোন করলাম। ফোনটা ধরলেন হাজি মোরশেদ। আমি তাকে জানাতে বললাম যে, আমার আশঙ্কা আর্মি মুজিবের বাড়ি আক্রমণ করতে পারে। তাকে নিরাপদ স্থানে সরে পড়া দরকার। বারোটা পঞ্চাশ মিনিটে মুজিবের বাড়িতে পুনরায় টেলিফোন করলাম। এ সময়ও টেলিফোনের অপর পারে হাজি মোরশেদকে পেলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মুজিব নিরাপদ জায়গায় সরেছেন কি না। হাজি মোরশেদ কাঁদতে লাগলেন। বললেন- "আমরা তার পা ধরেছি এবং বারবার তাকে অনুরোধ করেছি বাড়ি থেকে সরে যাওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি রাজি নন। তিনি দেখতে চান তারা তাকে কী করে।" রাত ১টা ১০ মিনিটের সময় যখন আমি পুনরায় মুজিবের বাড়িতে টেলিফোন করার চেষ্টা করলাম। টেলিফোনের লাইন কাটা। মুজিব রাত ১টা থেকে দেড়টার মধ্যে গ্রেফতার হন।"[১]

মার্চের ১৫ তারিখ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত পর্দার অন্তরালে যা ঘটেছিল, যার বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি, তার যে বিবরণ জনাব মওদুদের কাছ থেকে পাওয়া গেল, তা থেকে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার। এক. জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল। দুই. প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণার মাধ্যমে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই একমত হয়েছিল। তিন. আওয়ামী লীগ তৈরি প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণার খসড়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু ভুট্টো এর সাথে একমত হননি। চার. ২৫ মার্চ সামরিক অভিযানের পূর্ব পর্যন্তও শেখ মুজিব আলোচনার ইতিবাচক ফল আশা করেছেন।

---

১. Bangladesh Constitutional Quest for Autonomy, Page 237-249 (Moudud Ahmad)

পাঁচ. মুজিব-ইয়াহিয়ার সম্মত ফরমুলা গ্রহণ না করে পাপ করল ভুট্টো, কিন্তু সামরিক হামলার শিকার হলো শেখ মুজিব, মুজিবের অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা জনাব রেহমান সোবহানও জনাব মওদূদের কথারই প্রতিধ্বনি করছেন। তিনি বলছেন:

'ইয়াহিয়া প্রকৃতপক্ষে মুজিবের সব দাবি শুরুতেই মেনে নিয়েছিলেন। এই মেনে নেওয়াটা ভুট্টোকে বিক্ষুব্ধ করেছিল, যার ফলে তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে পৃথকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর দাবি করলেন। এর দ্বারা তিনি দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্ভব ঘটালেন এবং গোটা পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলার শেখ মুজিবের অধিকার তিনি কেড়ে নিতে চাইলেন। পাঠান ও বেলুচরা ভুট্টোর এ মতের তীব্র বিরোধিতা করল এবং বলল, যেহেতু এক ইউনিট হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো অস্তিত্ব নেই, তাই ভুট্টো বললে শুধু পাঞ্জাব ও সিন্ধুর পক্ষেই কথা বলতে পারেন।

এই পরস্পর বিরোধী দাবির মুখে মুজিব কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকারের সম্ভাবনার সম্মুখীন হলেন। কিন্তু কোয়ালিশন গ্রহণ করলেও তিনি ১৬৭ জন সদস্য ৮৭ জন সদস্যের কাছে সংখ্যা সাম্য মানতে পারেন না। সংকট উত্তরণের জন্য একটা সমঝোতা এভাবে হলো যে, প্রদেশগুলোর ক্ষমতা সংখ্যাগুরু দলের হাতে হস্তান্তর হবে এবং অন্তবর্তীকালীন সময়ে ইয়াহিয়াই কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকবেন। কিছু পরামর্শ এমন এলো যে, দলগুলো কেন্দ্রে উপদেষ্টা পাঠাবে।... উল্লেখ্য যে, অন্তবর্তীকালীন সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের আন্তঃপ্রাদেশিক বিষয়গুলো কেন্দ্রের হাতে থাকবে। এটাসহ অন্যান্য সব প্রস্তাবই অন্তবর্তীকালীন পর্যায়ের জন্য। ভিন্ন ভিন্ন বৈঠকে নিজের কাজ সমাধা করার পর দুই অংশ, জাতীয় পরিষদের পূর্ব ও পশ্চিম একত্রে মিলিত হয়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য যুক্ত অধিবেশনে বসবে।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, আলোচনা ভেঙে পড়েনি। প্রকৃতপক্ষে মৌল সব বিষয়েই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ২৩ মার্চের বৈঠকটাই ছিল শেষ বৈঠক এবং একটি চূড়ান্ত বৈঠকের আহ্বান কোনোই জবাব পায়নি। গোটা সময়ে ইয়াহিয়ার তরফ থেকে কোনোই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি এবং বলেননি যে, ফয়সালার জন্য তার শর্তটা কী। সব আলোচনাই চলছিল প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণায় আওয়ামী লীগের তৈরি খসড়া নিয়ে। এভাবে আওয়ামী লীগের কথা সবই প্রকাশ পেল, কিন্তু ইয়াহিয়া তার জান্তার মনোভাবটা বিশ্ববাসীর অজানাই থেকে যাচ্ছিল। ভুট্টো তার টিম নিয়ে ঢাকা এসেছিলেন এবং আলাদাভাবে প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা চালাচ্ছিলেন। আওয়ামী লীগ মনে করছিল, তাদের আলোচনার ফল ইতিবাচক সিদ্ধান্তকরীই হবে। যেহেতু প্রেসিডেন্টের কাছে ভুট্টোর ব্রিফিং পুরোপুরিই ছিল, সুতরাং এ ভয় জাগেনি যে, ভুট্টো মুজিব-ইয়াহিয়া ঐকমত্যের বিরোধিতা করেন।

২৫ মার্চের রাত ১১টায় সেনা অভিযান শুরু হলো। এর কিছু আগে ইয়াহিয়া করাচি চলে গেলেন। যুদ্ধ এসে গ্রাস করল আলোচনাকে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত একটি সমাধান, যা সেদিন পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারত, সেনাপতিদের হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল, কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করল।[২]

---

২. South Asian Review, volume 4. Number 4 July, 1971 (Negotiating for Bangladesh: A participam's view, Ratusan Sobhan).

পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল যে, তিনি কনফেডারেশনের প্রস্তাব দিয়ে প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানকেই ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। শেখ মুজিব নাকি এ লক্ষ্যেই জাতীয় পরিষদকে দুই ভাগ করে দুই শাসনতান্ত্রিক কনভেনশনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পাকিস্তান সামরিক সরকারের এ অভিযোগ যে মিথ্যা, তা ওপরের আলোচনায় দেখা গেছে। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদও এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। মুজিব নগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নীতি নির্ধারণী ভাষণে তিনি এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে সবার কাছে তুলে ধরেন। তিনি বলেন-

"প্রতারণার কৌশল হিসেবেই ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সাথে আলোচনায় আপসমূলক মনোভাব প্রদর্শন করলেন। ১৬ মার্চ থেকে যে আলোচনা শুরু হলো, তাতে ইতোমধ্যে যা ঘটে, গেছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে তার আন্তরিক মনোভাব ব্যক্ত করলেন। বৈঠকে শেখ মুজিবের চার দফা শর্ত সম্পর্কে সামরিক সরকারের সুস্পষ্ট মনোভাব জানতে চাওয়া হয়েছিল। তিনি জানালেন যে, বড়ো ধরনের কোনো আপত্তি তাদের নেই। এবং তিনি বললেন, উভয়পক্ষের উপদেষ্টারা নিচের চারটি পয়েন্টের ভিত্তিতে অন্তবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারে। উভয়পক্ষের ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত সেই চারটি পয়েন্ট হলো-

ক. সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং প্রেসিডেন্টের ঘোষণার (Presidential Proclamation) মাধ্যমে বেসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।

খ. প্রদেশগুলোর ক্ষমতা প্রদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের হাতে হস্তান্তর।

গ. ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট থাকবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করবেন।

ঘ. শাসনতন্ত্র চূড়ান্তকরণের আগে জাতীয় পরিষদের একক বৈঠকের আগে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যরা শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়নের জন্য পৃথক ভাবে বৈঠকে মিলিত হবে।

ইয়াহিয়া ও ভুট্টো যে কথাটা বলছেন, সত্য তার বিপরীত। ভুট্টোর দাবি পূরণের জন্য জাতীয় পরিষদের পৃথক বৈঠকের প্রস্তাব ইয়াহিয়াই করেছিলেন। তিনি তার প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি দেখান যে, ৬ দফা পূর্ব পাকিস্তানের সাথে কেন্দ্রের সম্পর্ক নির্ধারণের একটা পরিকল্পনা, পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি করবে। এ কারণেই পশ্চিম পাকিস্তান ও কেন্দ্রের মধ্যে এক ইউনিট বাতিল হওয়া এবং ৬ দফার আলোকে একটা নতুন সম্পর্ক নির্মাণের সুযোগ পশ্চিম পাকিস্তানের এমপিদের দিতে হবে। শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে একবার এ নীতিগত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাকি ছিল অন্তবর্তীকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে কেন্দ্রের ক্ষমতা নির্ধারণের বিষয়টাই শুধু। আরও একটা বিষয়েও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটা হলো, ক্ষমতার বণ্টনটা দফার ভিত্তিতে হবে। আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, আলোচনার কোনো পর্যায়েই আলোচনা ভেঙে পড়েনি কিংবা ইয়াহিয়া বা তার টিমের তরফ থেকেও এমন ইঙ্গিত কখনো

আসেনি যে, আলোচনা অচলাবস্থায় পৌঁছেছে, যা অতিক্রম করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই যে নীতিগতভাবে একমত হয়েছিল, তা ভুট্টোর ২৫ মার্চের সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য থেকেও পরিষ্কার।

২৪ মার্চ ইয়াহিয়া ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টাদের মধ্যকার শেষ বৈঠকের পর আওয়ামী লীগ খসড়া ঘোষণা চূড়ান্ত করার জন্য জেনারেল পীরজাদার তরফ থেকে একটা ফাইনাল বৈঠকে যোগ দেওয়ার আহ্বানের অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সে আহ্বান আর এলো না। তার বদলে ইয়াহিয়ার প্রধান আলোচক জনাব এম. এম. আহমদ আওয়ামী লীগকে কিছু না জানিয়েই হঠাৎ করাচির পথে পাড়ি জমালেন।

২৫ মার্চ রাত ১১টার মধ্যে সেনাবাহিনীর লোকেরা নগরীর বিভিন্ন স্থানে তাদের অবস্থান নিতে শুরু করল। সমসাময়িক ইতিহাসের এক নজিরবিহীন বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে ঢাকার শান্তিপূর্ণ ও নিশ্চিত জনগণের ওপর গণহত্যার এক সুপরিকল্পিত কর্মসূচি চাপানো হলো।

ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগকে কিছুই জানালেন না, তার কোনো চূড়ান্ত প্রস্তাবও আওয়ামী লীগের কাছে পেশ করলেন না।"[৩]

ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনার শেষ মূহূর্তগুলোর আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে মুজিবের আলোচনা টিমের অন্যতম সদস্য, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ড. কামাল হোসেন এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের একটি অংশে তিনি বলেন-

২৩ মার্চ ছিল অস্বাভাবিক একটি দিন। এ দিনটি পাকিস্তান দিবস হিসেবে পালিত হয়ে এসেছে। কিন্তু আজকের দিনটি এমন ছিল যখন হাজার হাজার বাংলাদেশি পতাকা বিক্রি হচ্ছে। মনে পড়ে, সকাল ৬টার সময় আমার অফিস থেকে খসড়া ঘোষণার সংশোধিত কপি সহ শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে যাওয়ার পথে নওয়াবপুর রেলক্রসিং থেকে একটা বাংলাদেশি পতাকা কিনলাম। ৭টার দিকে আমি শেখ মুজিবের বাসায় পৌঁছলাম। বহু মিছিল এলো এবং তার বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হলো।

সকাল সাড়ে ১১টার দিকে আওয়ামী লীগ টিম একটি গাড়িতে প্রেসিডেন্ট হাউজে প্রবেশ করল। গাড়িতে ছিল বাংলাদেশের পতাকা। গাড়ির এ পতাকা প্রেসিডেন্ট হাউজে মোতায়েন সৈনিকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল।

আলোচনা শুরু হলে এম. এম. আহমদ বললেন, তার মতে হয় ৬ দফা কর্মসূচি ক্ষুদ্র কয়েকটা বাস্তবমুখী পরিবর্তনসহ বাস্তবায়িত করা যাবে। জেনারেল পীরজাদা প্রস্তাব করলেন, এম. এম. আহমদ এ লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের অর্থ বিশেষজ্ঞদের সাথে বৈঠকে বসতে পারেন এবং তিনি নূরুল ইসলামের নাম করলেন। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ বিশেষজ্ঞ জনাব নূরুল ইসলাম, আনিসুর রহমান, রেহমান সোবহান এবং অন্যারা ধানাব নূরুল ইসলামের বাসভবনে নিয়মিত বৈঠক করেই এসেছিলেন এবং আওয়ামী লীগের সংশোধিত খসড়া ঘোষণার মুদ্রা ও অর্থবিষয়ক ধারাগুলো তাদেরই সমর্থনে তৈরি।

---

৩. Press statement issued by Mr. Tajuddin Ahmed, Prime Minister of Bangladesh, on 17th April, 1971, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯-৩১

আওয়ামী লীগ টিম ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাগণ উত্থাপিত অর্থ বিশেষজ্ঞদের পৃথক মিটিং-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তাদের মতে এটা ছিল সময় ক্ষেপণকারী একটা কৌশল।

২৩ মার্চ' বিকেলের বৈঠকে এম. এম. আহমদ খসড়া ঘোষণার কিছু সংশোধন ও সংযোজনসংবলিত কয়েকটি চিরকুট হাজির করেন।

আওয়ামী লীগ টিমকে তাদের অর্থ বিশেষজ্ঞদের সাথে বসার জন্য ছাড়া হলো। আওয়ামী লীগ অর্থ বিশেষজ্ঞদের বৈঠক অব্যাহতভাবে চলছিল প্রফেসর নূরুল ইসলাম সাহেবের বাসভবনে। এম. এম. আহমদ উত্থাপিত সংশোধনীগুলো বৈঠকে আলোচনা করা হলো এবং বৈদেশিক মুদ্রার সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা, ইত্যাদিসংক্রান্ত বিষয়ে এক এক করে নীতিমালা তৈরি হলো সরকারি পক্ষের কাছে পেশ করার জন্য।

এ অর্থনৈতিক নীতিমালা বিষয়ে আলোচনার জন্য আওয়ামী লীগ টিম ২৩ তারিখ বিকেলে আবার আলোচনায় ফিরে গেল। সেখানে তারা শুনলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সারাদিন প্রেসিডেন্ট হাউজ থেকে অনুপস্থিত আছেন। নানা ঘটনা থেকে প্রমাণ হলো, ২৩ মার্চ গোটা দিনই জেনারেলরা মিটিং এ কাটিয়েছেন। পরিস্থিতির এ অবস্থা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, মুদ্রা ও অর্থনীতি বিষয়ে এম. এম. আহমদ আওয়ামী লীগ টিমের সাথে যে আলোচনা চালাচ্ছেন, তা সময় ক্ষেপণ করে সামরিক সমাধানের পথ প্রশস্ত করার জন্যই। ২৪ মার্চ সকাল পর্যন্ত খসড়া ঘোষণার অর্থনৈতিক ধারাগুলো এক এক করে রুজ বাই ক্লজ পাঠ ও পর্যালোচনা সমাপ্ত হলো।

অতঃপর আওয়ামী লীগ টিম যখন ২৪ মার্চ বিকেলের আলোচনা বৈঠকে যোগদানের জন্য প্রেসিডেন্ট হাউজে যাত্রা করছিলেন, তখন শেখ মুজিব ইঙ্গিত দিলেন যে, রাষ্ট্রের নাম আমাদের 'কনফেডারেশন অব পাকিস্তান' প্রস্তাব করা উচিত। তিনি বললেন, তাদেরকে আমাদের বোঝানো উচিত, জনগণের যে সেন্টিমেন্ট, তার কারণেই এটা প্রয়োজন। এ প্রস্তাব অংশত স্বাধীনতার জনপ্রিয় দাবির প্রতিফলন যা বিশেষ করে গণ-আন্দোলনের অগ্রবাহিনী মিলিট্যান্ট যুবকরা চাচ্ছিল। এ প্রস্তাব যখন সরকারি পক্ষের কাছে পেশ করা হলো, তারা এর তীব্র বিরোধিতা করল এই বলে যে, আমাদের অবস্থানের এটা মৌলিক পরিবর্তন। আমরা যুক্তি দিলাম যে, সব বিষয় ও নীতিমালা যখন ঠিক থাকছে, নিছক নামের একটা পরিবর্তনে মৌলিক পরিবর্তন হয় না। মনে হলো বিচারপতি কনেলিয়াস আমাদের যুক্তি বুঝলেন। কিন্তু তিনি আমাদের প্রস্তাবের পালটা বললেন-'কনফেডারেশন'-এর বদলে 'ইউনিয়ন' শব্দ গ্রহণ করা যেতে পারে। এরপর আওয়ামী লীগ টিম মত প্রকাশ করল যে, মতপার্থক্যটা একটা শব্দ দিয়ে, এ মত পার্থক্যটা যদি আমরা দূর করতে না পারি, তাহলে বিষয়টার সমাধান শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার বৈঠকে হবে, যখন খসড়া ঘোষণার চূড়ান্তকরণ করা হবে।

এটা মনে হয়েছিল, ২৪ মার্চের বিকেলের বৈঠক তাদের শেষ বৈঠক হবে, যেখানে আলোচনা উপসংহারে পৌছবে। কারণ আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার মতো পয়েন্ট আর কমই আছে।

২৪ মার্চ বিকেলের আলোচনা বৈঠকে খসড়া ঘোষণার সব ক্লজ ও শিডিউল একসাথে পড়া সম্পূর্ণ হলো। আমি তখন জরুরি বিষয় হিসেবে পীরজাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, খসড়া

কখন চূড়ান্ত করা হবে? আওয়ামী লীগ পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হলো, আমি ও কর্নেলিয়াসকে আজ রাতেই খসড়া ঘোষণা চূড়ান্ত করার জন্য বসা দরকার, যাতে পরের দিন সকালেই এটা ইয়াহিয়া ও মুজিবের কাছে পেশ করা যায়। কর্নেলিয়াস এ প্রস্তাবের সাথে একমত হলেন। কিন্তু জেনারেল পীরজাদা বললেন-'না, আজ আমাদের আরও কাজ আছে, আপনারা আগামীকাল সকালে বসতে পারেন।' আমি আবার পরামর্শ দিলাম, 'কাল ক'টায় বৈঠক হবে?' ঠিক করা হোক।' কিন্তু জেনারেল পীরজাদা পুনরায় বাধা দিয়ে বললেন- 'এটা টেলিফোনেই ঠিক করা যাবে এবং তার সাথে এ ব্যাপারে ফোনে যোগাযোগ করা হবে।' তারপর পীরজাদা আমার দিকে ফিরে বললেন-'কখন ঘোষণাটা চূড়ান্ত হয়ে যাওয়া উচিত বলে মনে করেন?' উত্তরে আমি বললাম- 'আগামী পরশুর আগেই এটা হয়ে যাওয়া উচিত।' এ সময় তাজউদ্দীন বললেন-'আওয়ামী লীগ টিম মনে করে তারা প্রত্যেকটি বিষয়ই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, আর আলোচনার কোনো বিষয়ই অবশিষ্ট নেই। যা এখন বাকি তা হলো, খসড়া ঘোষণা শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার কাছে অনুমোদনের জন্য পেশ করা। অনুমোদন হয়ে গেলেই প্রেসিডেন্টের ঘোষণা জারি হতে পারে।' তাজউদ্দীন এর কথাটিকে পরে এভাবে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ আলোচনা ভেঙে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এর মধ্যে সত্যের কোনো নামগন্ধ নেই। যখন বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে, তখন তো বাকি ছিল শুধু শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার কাছে অনুমোদনের জন্য পেশ করণার্থে খসড়া ঘোষণার চূড়ান্তকরণ করার কাজটিই।

দুর্ভাগ্যজনক ২৫ মার্চের গোটা দিন আমি পীরজাদার টেলিফোনের অপেক্ষা করেছি। কিন্তু সে টেলিফোনটি কখনোই এলো না। অবশেষে ২৫ মার্চের রাত ১০টা ৩০ মিনিটের দিকে আমি উঠে বাড়ি ফেরার জন্য শেখ মুজিবের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম, তখন শেখ মুজিব টেলিফোনটি পেলাম কি না জিজ্ঞেস করলেন। পাইনি তা আমি তাকে জানালাম।"[৪]

দেখা যাচ্ছে, ২৫ মার্চে এসে ইয়াহিয়ার আলোচক দল ও শেখ মুজিবের আলোচক দলের মধ্যে দৃশ্যত পার্থক্যটা ছিল মাত্র পাকিস্তানের নাম নিয়ে। আওয়ামী লীগ টিম প্রস্তাব করেছিল, পাকিস্তানের নাম হবে 'কনফেডারেশন অব পাকিস্তান।' প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার টিম থেকে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়েছিল। এ মত পার্থক্যটা ছিল খুবই ছোটো। সন্দেহ নেই, শেখ মুজিব মিলিট্যান্ট ছাত্র-যুবক যারা স্বাধীনতার দাবি তুলেছিল, তাদের শান্ত করার জন্যই এ প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কোনোক্রমেই ছোট্ট এ বিরোধটা অনতিক্রম্য ছিল না। আওয়ামী লীগ এ কথা বলেও ছিল যে, বিষয়টার সমাধান উপদেষ্টা লেবেলে না হলে ইয়াহিয়া-মুজিবের শীর্ষ বৈঠকের জন্য রেখে দেওয়া যেতে পারে।

যাহোক, সব বিবরণ থেকেই এ কথা পরিষ্কার যে, শেখ মুজিব দুই কূল রক্ষা হতে পারে এমন একটা রাজনৈতিক সমাধান আশা করছিলেন এবং এ কারণেই আমরা দেখি, তিনি ২৫ মার্চ রাত সাড়ে দশটাতেও ড. কামাল হোসেনকে জেনারেল পীরজাদার টেলিফোন এসেছে কি না জিজ্ঞেস করছেন। কিন্তু তিনি টেলিফোনটা পেলেন না কেন? কেন

---

৪. The Daily News, March 26, 1971

জেনারেল পীরজাদা আওয়ামী লীগ টিমের কাছে মিথ্যা কথা বললেন? ইয়াহিয়া কেন অপেক্ষমাণ শেখ মুজিবকে কোনো কথা জানালেন না? কেন ইয়াহিয়া জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরসংক্রান্ত রাজনৈতিক সমাধানের ফরমূলায় উভয়পক্ষ একমত হওয়ার পর তার বাস্তবায়ন না করে এবং শেখ মুজিবের কাছে চূড়ান্ত কোনো বিকল্প প্রস্তাব না দিয়ে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন? এ প্রশ্নগুলোর জবাবের কিছুটা পাওয়া গেছে সেই সময়ে ঢাকায় কর্মরত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসার জনাব সিদ্দিক সালিকের কাছ থেকে। তিনি তার উইটনেস টু সারেন্ডার (যার বাংলা অনুবাদ নিয়াজি আত্মসমর্পণের দলিল) গ্রন্থে সেদিন পর্দার অন্তরালে যা ঘটেছিল, তার একটা ঘনিষ্ঠ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন- "প্রেসিডেন্ট বেলা ৩টায় (১৫ মার্চ) পৌঁছলেন। পি এ এফ-এর স্কোয়াড্রন লিডার কাজী অবতরণ সেতুটি টেনে নিয়ে গেলেন। প্রেসিডেন্ট বিমান থেকে নামলেন। তার ফোলা চেহারা ও সুস্বাস্থ্য সতেজদীপ্ত জীবনীশক্তির পরিচয় বহন করছিল। তিনি রীতি অনুযায়ী কথা বলছিলেন না। তবে তার কথার ধরনে আস্থা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যে বিমান চালকরা তাকে শ্রীলংকা ঘুরিয়ে উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল, তাদের প্রসঙ্গ তুলে বলেন-ওরা দারুণ সাহসী ছেলে। চমৎকার কাজ দেখিয়েছে। তারপর তিনি সবার সাথে হাত মেলালেন; এমনকি আমার সাথেও। মনে হলো তার বিবেক কিংবা মনের ওপর কোনো বোঝা নেই। রুটিন অনুযায়ী সেনা ইউনিট পরিদর্শন কালে তাকে যেমন ফাঁকা মনে হয় তেমনই মনে হলো। প্রতিটি মিনিটে, প্রতিটি ঘণ্টায় এবং দিনের পর দিন ধরে আমরা যে বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে জীবনযাপন করেছি, সে সম্পর্কে তার ভেতর কোনো প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন পরিলক্ষিত হলো না।

ইতোমধ্যে চার তারকা প্লেট লাগানো একটি গাড়ি ভি আই পি-দের সামনে এসে দাঁড়ালো। জেনারেল টিক্কা খান হেলিকপ্টারের দিকে তাকিয়ে প্রেসিডেন্টকে বললেন, আপনি কি কারে যেতে চান?

'তোমার কি সন্দেহ আছে তাতে?' প্রেসিডেন্ট বললেন, 'না তা নয়। আমি বলছিলাম, হেলিকপ্টারও তৈরি।' 'না আমি সড়ক পথেই যাব', প্রেসিডেন্ট বললেন। প্রেসিডেন্টের গাড়িতে টিক্কা খানও উঠলেন। অন্যরাও তাদের গাড়িকে অনুসরণ করল। ১৮-পাঞ্জাব-রেজিমেন্টের একটা কোম্পানি পাহারা দিয়ে এগিয়ে চলল। বেতারে প্রেসিডেন্টের যাত্রার অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট হাতে থাকল... 'তিনি নিরাপদে ফার্মগেট অতিক্রম করলেন... তিনি এখন ভি আই পি ভবনের দিকে এগোচ্ছেন... মোটর গাড়ির বহর এবার প্রেসিডেন্ট হাউজে যাওয়ার সর্বশেষ মোড় অতিক্রম করছে... প্রেসিডেন্ট নিরাপদে তার নিবাসে পৌঁছে গেছেন।' সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। একটা মস্তবড় বাধা শান্তিপূর্ণভাবে অতিক্রম করা গেল। একই দিন সন্ধ্যায় জেনারেল ইয়াহিয়া খান স্থানীয় সিনিয়র সামরিক অফিসারদের ডেকে পাঠালেন পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য। জেনারেল-টিক্কা খান, খাদেম, ফরমান এবং এয়ার কমোডর মাসুদও উপস্থিত ছিলেন ওই বৈঠকে। সেনাবাহিনীর নিজস্ব ধারায় ব্রিফিং শুরু হলো। আলোচনা এগিয়ে চলল নির্ধারিত রীতিতে, যেমন, মিশনের ব্যাখ্যা, সমস্যার গুরুত্ব (আইনশৃঙ্খলার নিরিখে), সেনাশক্তির প্রাপ্যতা এবং বিভিন্ন

এলাকায় তাদের বাটোয়ারা, ইত্যাদি বিষয়ক। সর্বশেষে আস্থাসূচক মন্তব্যের মধ্য দিয়ে ব্রিফিং শেষ হলো।

ব্রিফিং এ রাজনৈতিক জটিলতা ও গভীরতার বিষয়টি প্রেসিডেন্টের সামনে তুলে ধরা হলো না। কোনো সুপারিশও করা হলো না। এ বিষয়টি কেন বাদ পড়ল, তা জানতে চেয়েছিলাম একজন সিনিয়র অফিসারের কাছে। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট এ নিয়ে কিছুই জানতে চাননি। এ ব্যাপারে তার উপদেশকরা রয়েছেন। তাদের বিশ্লেষণের ওপরই নির্ভর করছেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজনের মতামতের জন্য তিনি খোড়াই কেয়ার করেন।

ব্রিফিং শেষে প্রেসিডেন্ট বলেন, ভাবনার কিছু নেই। মুজিবের ব্যবস্থা কালকেই করছি আমি। তাকে আমার মনের ইচ্ছা একটুখানি জানিয়ে দেবো। শীতল চেহারা দেখাব এবং তাকে দ্বিপ্রাহরিক ভোজেও আমন্ত্রণ জানাব না। এরপর পরের দিন আমি তার সাথে দেখা করব এবং এতে তার মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, সেটা দেখব। যদি সে ভালো ব্যবহার না করে, তাহলে এর জবাব কী দিতে হবে-তা আমি জানি।

প্রেসিডেন্টের কথা শেষ হতেই নীরবতা নেমে এলো। একটি অস্বস্তিজনক মুহূর্ত। এ সময় দীর্ঘকায় ঋজু দেহের পেশিবহুল এক ব্যক্তি ঘাড় উঁচু করে দাঁড়ালেন এবং কিছু বলার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। মাথা নেড়ে তাকে অনুমতি দেওয়া হলো। তিনি মুখ খুললেন- 'স্যার, অবস্থা খুবই নাজুক। মুখ্যত এটা একটি রাজনৈতিক ব্যাপার এবং রাজনৈতিকভাবেই এর সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। নইলে হাজার হাজার নিরপরাধ নারী, পুরুষ ও শিশু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

ইয়াহিয়া গভীর মনোযোগের সাথে শুনছিলেন এবং অন্যরা শুনছিলেন দুরু দুরু বক্ষে। প্রেসিডেন্ট মাথা নাড়লেন। যেন চাবুক দিয়ে আঘাত করলেন, এমনি স্বরে বললেন- 'মিঠঠি, আমি সেটা জানি আমি জানি।' মেঠঠি (মেজর জেনারেল মিঠা খান) বসে পড়লেন। কয়েক দিন পর তার দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। পরবর্তী সময়ে তিনি শুধু নিজ মনোবলের ওপরই টিকে ছিলেন। সভা ভেঙে গেল। এটাই ছিল ঢাকাতে ইয়াহিয়া খানের সর্বশেষ সামরিক সম্মেলন। এরপর তিনি তার রাজনৈতিক কার্যক্রমের দিকে মুখ ফেরালেন।

পরের দিন ২৫শে মার্চ প্রেসিডেন্ট হাউজে মুজিবের সাথে তিনি দেখা করলেন। দুজনের কোনো সাহায্যকারী ছিল না। মনে করা হলো, ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগানোর জন্য এটা একটা ঘরোয়া পদক্ষেপ। মুজিব যে তার হাতার ভাঁজে কিছু রেখেছেন, এ আবিষ্কার করতে তার বেশি সময় লাগল না। কেননা, নির্বাচন পূর্বকালে তিনি প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবাবলীতে যেভাবে খোলা মন নিয়ে সাড়া দিয়েছিলেন, এবার সে রকম হলেন না। প্রেসিডেন্ট নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লেন।

বৈঠক শেষ হওয়ার পর মুজিব প্রেসিডেন্ট হাউজ থেকে বেরিয়ে এলেন। তার গাড়িতে কালো পতাকা উড়ছিল। অপেক্ষমাণ সাংবাদিকরা তাকে গেটে থামাল। আমিও উপস্থিত ছিলাম সেখানে। কিন্তু আমার ইউনিফর্মের প্রতি মুজিব লক্ষ করলেন না। মনে হলো, তিনি ভারাক্রান্ত এবং উদ্বিগ্ন। আমি তার বাঁ কাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। চেহারা মলিন ও বিমর্ষ। তার দেহে কম্পন ছিল। উত্তেজনায় কাঁপছিল ঠোঁট।

ক্যান্টনমেন্টে এসে জানতে পারলাম জিওসি জেনারেল খানের কাছে গেছেন দিনের ফলাফল জানতে। জেনারেল টিক্কা খান তাকে বলেন- 'খাদিম (জিওসি মেজর জেনারেল খাদেম রাজা), তুমি যতটুকু জানো আমিও ততটুকই জানি।' 'কিন্তু স্যার', খাদেম রাজা বললেন-'কোনো রকম অসতর্কতা যাতে আপনাকে গ্রাস করতে না পারে, সেজন্য অকুস্থলের ব্যক্তি হিসেবে ঘটনার গতিধারার সাথে সংযোগ রাখার অধিকারী বাক্তি তো একমাত্র আপনিই।'

এর কিছুক্ষণ পর জেনারেল টিক্কা খানের স্টাফ কার প্রেসিডেন্ট হাউজে প্রবেশ করল। ইয়াহিয়া খান আলোচনার বিবরণী দানকালে বললেন- 'হারামজাদাটা ভালো ব্যবহার করল না। তুমি তৈরি হয়ে যাও।' রাত দশটায় টিক্কা খান জিওসিকে টেলিফোন করলেন। বললেন- 'খাদিম তুমি এগিয়ে যেতে পারো।' এর অর্থ এভাবে ধরে নেওয়া হলো, সামরিক কার্যক্রম শুরু করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কাগজপত্র তৈরি করা যেতে পারে। কেননা, সেনাবাহিনী সব সময় তৈরি থাকে। কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি রাজনৈতিক আলোচনা ধারার ওপর নির্ভরশীল। ঢাকার সেনা কর্তৃপক্ষ সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেসিডেন্টের ওপর চাপ সৃষ্টি করেনি। এরা তখনও রাজনৈতিক সমাধানের আশায় ছিল।"[৫]

ইয়াছিন মুজিব আলোচনার শেষ দিকের আরও একটা বিবরণ আমি লেঃ মোঃ কামাল উদ্দিনের গ্রন্থ (ট্র্যাজেডি অফ এররস) থেকে তুলে ধরছি। তিনি লিখেন, "২০শে মার্চ এবং ২১শে মার্চের মধ্য রাতে সবখানে একটা রমরমা ভাব বিরাজ করছিলো। সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলে যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য একটা চুক্তিতে পৌঁছা গেছে। কিন্তু এ রমরমা ভাব কিছুটা স্তিমিত হলো যখন ২১ শে মার্চ মুজিব এবং তাজউদ্দিন প্রেসিডেন্ট হাউসে অনির্ধারিত ভিজিটে যান এবং প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দেন যেন ঘোষণা থেকে ফেডারেল মন্ত্রী সভা গঠনের ব্যাপারটি বাতিল করা হয়।[৬] মুজিবের এ সুপারিশে ইয়াহিয়া এবং তার সহকারিরা এ উপলব্ধি করল যে, মুজিব আর পাকিস্তান চাচ্ছেন না। কামাল হোসেন ও একটা নতুন খসড়া পেশ করলেন। যা আগেরটা থেকে ভিন্ন ছিল। জেনারেল পীরজাদা খসড়াটা নিয়ে বলেন যে, সরকার এটাকে পর্যালোচনা করে দেখবে। ২৩ তারিখ সকাল ১১ টা ৪৫ মিনিটে প্রেসিডেন্ট টীমের সাথে একটি ২৬ পৃষ্ঠার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। যা গ্রহণ করা হলে তা হতো পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার লিখিত অনুমোদন। কামাল হোসেনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিল যখন ছিল যখন ২৪ শে মার্চ (বৈঠকে) তিনি এসে প্রস্তাব করলেন যে, আওয়ামী লীগের খসড়ার ফেডারেশন শব্দ বদলিয়ে কনফেডারেশন করা হোক। (পরে মজিবের সাথে কথা হওয়য়ার পর) কামাল হোসেন বললেন, ফেডারেশন কথাটাই থাকবে। তিনি এটাও বললেন যে, ব্যাপারটা বহু বন্ধু ও ইয়াহিয়ার হাতে ছেড়ে দেয়া যায়। যাতে তারাই এ বিষয়ে ফায়সালা করেন।[৭] ■

---

৫. নিয়াজীর আত্মসমর্পনের দলিল (witness to surrender), পৃঃ ৭১-৮১ গ্রন্থটির লেখক সিদ্দিক সালিফ পাক বাহিনীর মেজর এবং তখন গণসংযোগ কর্মকর্তা দিলেন। দক সালিন শাক আহিলার, সেতুর ছিলেন এবং দিলেন।

৬. ছাত্রদের চাপে বাধ্য হয়েই শেখ মুজিব একমত হওয়া সিদ্ধান্ত থেকে এইভাবে সরে আসেন। যার কারণে আলোচনা খন্ডুল হয়ে যায়।

৭. ট্রাজেডি অফ এররস, লে. জে. কামাল মতিনউদ্দনী, পৃষ্ঠা: ১৫৩, ১৫৫, ১৫৭।

ফাত্ওয়া ও ফাত্ওয়া দানের যোগ্যতা

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .

ভূমিকা

ইসলামে ফাত্ওয়া প্রদানের যেমন গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে তেমনি ঝুঁকিও রয়েছে অপরিসীম, কেননা ফাত্ওয়া প্রদানকারী প্রকৃত পক্ষে আলাহর পক্ষ হতে দীন সংক্রান্ত বিষয়াদি বর্ণনা করে থাকেন। হালাল-হারাম ব্যক্ত করেন, সেজন্য আমাদের পূর্ব সূরীরা সহজে ফাত্ওয়ার কাজে জড়িত হতে চাইতেন না। আবার ইল্ম গোপন করার আশংকা ও জবাবদিহিতার ভয়ে দূরেও থাকতে পারতেন না। ফাত্ওয়া প্রদানের কাজ স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন করেছেন। তারপর প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তারপর সাহাবা কিরাম (রা), তাবে'য়ী ও তাবে তাবে'য়ীগণও করেছেন। কিয়ামাত পর্যন্ত এ কাজ চালু থাকবে। সুতরাং ইল্ম ও যোগ্যতা ছাড়া ফাত্ওয়া প্রদান কোন ক্রমেই বৈধ নয়। একদল যোগ্যতা সম্পন্ন মুসলিমকে এ কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে।

ফাত্ওয়া শব্দের ব্যবহার

ফাত্ওয়া সংক্রান্ত চারটি শব্দ আরবী ও ইসলামী পরিভাষায় অধিক ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলো হলো : **فَتْوى** (ফাত্ওয়া), **فُتْيَا** (ফুত্ইয়া), **إفتاء** (ইফতা) ও **اِسْتِفْتَاء** (ইস্তিফ্তা)। এর মধ্যে ফাত্ওয়া শব্দটি দুইভাবে পড়া যায়। (ক) ফা-এর উপর যবর **فَتْوى** (ফাত্ওয়া), (খ) ফা- এর উপর পেশ **فُتْيَا** (ফুত্ইয়া)। তবে আরবী ভাষায় শব্দটি ফাত্ওয়া-এর চেয়ে ফুত্ইয়া হিসাবে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইব্ন মানযুর তাঁর অভিধান "লিসানুল আরব-এ উল্লেখ করেন :

الفتوى والفتيا اسمان يوضعان من موضع الإفتاء إلا أن لفظة الفتيا اكثر استعمالاً فى كلام العرب من لفظة الفتوى.

ফাত্ওয়া এবং ফুত্ইয়া দু'টি বিশেষ্যকে ইফতা' শব্দের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। তবে আরবী ভাষায় 'ফাত্ওয়া' শব্দের তুলনায় 'ফুত্ইয়া' শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১] হাদীসের প্রসিদ্ধ নয়টি কিতাবে মোট ৩০ বার ফুত্ইয়া হিসাবে শব্দটি উলেখিত

১. ইবন মানযুর, লিসানুল আরব, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লুবনান, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২০।

হয়েছে।[২] ঐ সমস্ত কিতাবে কোথাও ফাত্ওয়া শব্দটির উলেখ নেই। তবে অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে উভয় শব্দ এক, উভয়ের ব্যবহার শুদ্ধ। এদের বহুবচন হলো فَتَاوى (ফাতাওয়া) এবং فَتَاوِىْ (ফাতাবি)।[৩]

ফাত্ওয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ

ফাত্ওয়া এবং ফুত্ইয়ার শাব্দিক অর্থ হলো– রায়, মত, সিদ্ধান্ত।[৪] লিসানুল আরব অভিধানে বলা হয়েছে– ما أفتى به الفقيه ফাকীহ যা রায় দেন বা সিদ্ধান্ত দেন।[৫] মুফরাদাতুল কুরআন অভিধানে বলা হয়েছে, الجواب عمايشكل من الفتيا والفتوى: الأحكام। অর্থাৎ ফাত্ওয়া ও ফুত্ইয়া হলো বিধি বিধানের জটিল প্রশ্নের উত্তর। মু'জামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে, الجواب عمايشكل من المسائل الشرعية أو القانونية। الفتوى: অর্থাৎ ফাত্ওয়া হলো ইসলামী বিধি বিধান অথবা আইন কানুনের জটিল মাসয়ালার উত্তর। ইফতার অর্থ হলো ফাত্ওয়া প্রদান করা এবং ইসতিফতার অর্থ হলো ফাত্ওয়া চাওয়া। সে অনুযায়ী যিনি ফাত্ওয়া প্রদান করেন তাকে মুফতী বলা হয় আর যিনি ফাত্ওয়া চান তাকে মুসতাফ্তী বলা হয়। ফাত্ওয়া শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন : শব্দটি الْفُتُوَّةُ। থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ হলো বদান্যতা, মহানুভবতা ও মহত্ব। অতএব, ফাত্ওয়াকে ফাত্ওয়া এজন্য বলা হয়, ফাত্ওয়া প্রদানকারী অর্থাৎ মুফতী তাঁর নিজ বদান্যতা ও মহানুভবতা দ্বারা কোন দীনী সমস্যার সমাধান করে দেন। আবার অন্যরা বলেছেন যে, ফাত্ওয়া শব্দটি فَتِىٌّ শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ হলো দৃঢ়তা, শক্তি ও অটল থাকা। এ ক্ষেত্রে ফাত্ওয়াকে ফাত্ওয়া এজন্য বলা হয় যে, মুফতী তাঁর দলীল-প্রমাণাদির মাধ্যমে মাসয়ালাটিকে শক্তিশালী করেন। দৃঢ়তার পর্যায়ে নিয়ে যান।[৬]

সুতরাং ফাত্ওয়া, ফুত্ইয়া ও ইফতার শাব্দিক অর্থ হলো : কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, উত্তর প্রদানের মাধ্যমে বিরাজমান অস্পষ্টতা দূর করা ইত্যাদি। তা ইসলামী শারী'য়াতের বিধি-বিধান সম্পর্কিত হতে পারে, অথবা শারী'য়াত বহির্ভূত বিষয়াদিও হতে পারে। যেমন পবিত্র আল্ কুরআনে উলেখ রয়েছে যে,

(يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ) "তারা আপনার নিকট ফাত্ওয়া চায়, অতএব আপনি বলে দিন, আলাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ' (পিতৃহীন ও নিঃসন্তান) এর মীরাছ (অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি) সম্পর্কে ফাত্ওয়া (সুস্পষ্ট নির্দেশ) বলে দিচ্ছেন।"[৭]

---

২. সহীহ মুসলিমে ৪ বার, মুসনাদ আহমাদে ১২ বার, সুনানু আবু দাউদে ৩ বার, সুনানু নাসায়ীতে ২ বার, সুনানু ইবনে মা'জাতে ২ বার ও সুনানুদ দারেমীতে ৭ বার এসেছে।

৩. আহমাদ বিন মুহাম্মদ আল ফাইয়ূমী, আল মিছবাহুল মুনীর, মাকতাবাতু লুবনান, বৈরুত, ১৯৮৭, (ফাত্ওয়া শব্দ)।

৪. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫৪৮।

৫. ইবন মানযুর, লিসানুল আরব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২০।

৬. মুহাম্মাদ আমিন বিন উমার ইবনে আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার, আলাদ্ দুররিল মুখতার, দারু ইহইয়ায়িত্ তুরাসিল্ আরাবী, বৈরুত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭২।

৭. সূরা আন্ নিসা, আয়াত নং- ১৭৬।

অন্য আরেক আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে,

يَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنّ

"তারা আপনার নিকট নারীদের (বিবাহ) সম্পর্কে ফাত্ওয়া চায়। আপনি বলে দিন, আলাহ তোমাদেরকে তাদের (বিবাহ) সম্পর্কে ফাত্ওয়া (সুস্পষ্ট নির্দেশ) দিচ্ছেন।"[৮]

উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে ফাত্ওয়া প্রদানের বিষয়টি দীন ইসলাম সংক্রান্ত বিষয়ে জানার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, অপরদিকে শারী'য়াত বহির্ভূত বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর জানার দৃষ্টান্ত, যেমন পবিত্র আল্ কুরআনে, ইউসুফ আলাইহিস সাল্লামের ঘটনায় উল্লেখ রয়েছে যে,

يُوْسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيْقُ أَفْتِنَا فِىْ سَبْعِ بَقَراتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ

হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভী তাদের খাচ্ছে সাতটি শীর্ণ গাভী, এ সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে ফাত্ওয়া (পথ-নির্দেশ) দিন।[৯] আল্-কুরআনের অন্য এক জায়গায় সাবার সম্রাজ্ঞী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُوْنِىْ فِىْ أَمْرِىْ مَاكُنْتُ قَاطِعَةً أَمرًا حَتَّى تَشْهَدُوْنَ

(বিলকিস বললো), "হে পারিষদবর্গ, আমাকে আমার কাজে ফাত্ওয়া (পরামর্শ) দিন। আপনাদের সাথে পরামর্শ না করে কোন কাজে আমি ফায়সালা গ্রহণ করি না"।[১০]

উপরোক্ত উভয় আয়াতে ফাত্ওয়া শব্দটি শারী'য়াতের বহির্ভূত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। ১ম আয়াতে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট প্রশ্ন করা হয়েছে, শারী'য়াতের কোন মাসয়ালা জানার জন্য প্রশ্ন করা হয় নি। তদরুপ ২য় আয়াতে বিলকিস সম্রাজ্ঞী তাঁর পারিষদবর্গের নিকট স্বীয় কাজের ব্যাপারে পরামর্শ চেয়েছেন। শারী'য়াতের কোন বিধান সম্পর্কে জানতে চান নি।

ফাত্ওয়া শব্দের পারিভাষিক অর্থ

ফাত্ওয়া শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলো দীন ইসলাম সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া।[১১] যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন :

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهِ يُفْتِيْكُمْ فِى الكَلاَلَة

"তারা আপনার নিকট ফাতওয়া্ চায়। অতএব আপনি বলে দিন, আলাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ'-এর মীরাছ সম্পর্কে ফাত্ওয়া (সুস্পষ্ট নির্দেশ) দিচ্ছেন।"[১২]

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন :

يَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللهِ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ

---

৮. সূরা আন্ নিসা, আয়াত নং- ১২৭।
৯. সূরা ইউসুফ, আয়াত নং- ৪৬।
১০. সূরা আন্ নামল্, আয়াত নং-৩২।
১১. মুফতী মোঃ তাকী ওসমানী, উসূলুল ইফতা, মাকতাবাতু শায়খুল ইসলাম, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১১।
১২. সূরা আন্ নিসা, আয়াত নং- ১৭৬।

"তারা আপনার নিকট নারীদের (বিবাহ) সম্পর্কে ফাত্ওয়া চায়, আপনি বলে দিন, আলাহ তোমাদেরকে তাদের (বিবাহ) সম্পর্কে ফাত্ওয়া (সুস্পষ্ট নির্দেশ) দিচ্ছেন।"[১৩]

পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত এই শব্দ সম্বলিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। নিম্নে দু'টি হাদীস বর্ণনা করা হলো। তিনি ইরশাদ করেন :

(ألبِرُّما اطمأَنَّ إليه النَّفس واطمأَنَّ إليه القلب, والإثم ما حاك فِي النَّفسِ, وتردَّد فى الصَّدْرِ, وإن أفتاك النَّاس وأفتوك)

'পুণ্য হলো যাতে আত্মা ও অন্তর প্রশান্তি লাভ করে আর পাপ হলো যাতে অন্তরে খটকা লাগে এবং দ্বিধা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। যদিও লোকেরা তোমাকেই (আত্মিক প্রশান্তির বিপক্ষে) রায় প্রদান করে এবং তোমার জন্য জায়েজ করে দেয়।"[১৪]

তিনি আরো বলেন :

أجرؤكم عَلَى الفتيا أجرؤكم عَلى النَّار

"যিনি ফাত্ওয়া প্রদানে দুঃসাহস দেখান তিনি যেন জাহান্নামে যেতে দুঃসাহস দেখান।[১৫]

উপরে পারিভাষিক অর্থে দীন ইসলাম সম্পর্কিত বিষয়ের কথা উলেখ করা হয়েছে। এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, এর দ্বারা দীন ইসলাম সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় চলে আসে, মুয়ামালাত (লেন-দেন), মুয়াশারাত (জীবন-যাপন), শারী'য়াত (বিধি-বিধান), আকাইদ (ধর্মীয় বিশ্বাস) ইত্যাদি বুঝায়।

ফাত্ওয়া প্রদানে পূর্বসূরীদের সতর্কতা

রিয়াদুস সালেহীন নামক কিতাবের লেখক ইমাম মুহিউদ্দিন আন্ নাবাবী (৬৩১-৬৭৬খৃ.) উল্লেখ করেন :

اعلم ان الإفتاء عظيم الخطر, كبير الموقع, كثير الفضل, لأن المفتى وارث الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه, وقائم بفرض الكفاية, ولكنه فى معرض للخطاء.

ফাত্ওয়া প্রদান অতীব মর্যাদা, কৃতিত্ব ও ঝুঁকির কাজ। কেননা ফাত্ওয়া প্রদানকারী নবীকুলের (সালাওয়াতুল্লাহি আলাইহিম ওয়া সাল্লামুহু) উত্তরসূরী, ফারযে কিফায়াহ সম্পাদনকারী। কিন্তু তিনি ভুল-ভ্রান্তিরও সম্মুখীন হন।[১৬] আমাদের পূর্বসূরীরা ফাত্ওয়া প্রদানে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। ভয় করতেন, সহজে ফাত্ওয়া দিতে চাইতেন না, কেননা ফাত্ওয়া প্রদানকারী প্রকৃতপক্ষে আলাহর পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করে থাকেন। দীন দুনিয়ার বিষয়াদি তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী বর্ণনা করেন। ইল্ম ছাড়া

---

১৩. সূরা আন্ নিসা, আয়াত নং- ১২৭।
১৪. ইমাম আহমাদ বিন্ হাম্বল, মুসনাদ আহমাদ, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা, ১৯৪।
১৫. আবদুলাহ ইবন আবদুর রহমান আদ্ দারিমী, সুনানুদ-দারিমী, দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত, ১৪০৭ হি., খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৩।
১৬. হাফিয ইয়াহইয়া বিন্ শারাফ আন নাবাবী, আল মাজমু' মিন্ শারহিল মুহায্যাব, দারুল ফিক্র, বৈরুত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৭।

আল্লাহর উপর কোন কথা আরোপ করার ক্ষেত্রে পবিত্র আল্-কুরআনে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেন :

(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِه سُلْطَانًا وَّأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لاَتَعْلَمُوْنَ)

'আপনি বলে দিন : নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন। আরো হারাম করেছেন গুনাহর কাজ, সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি, আল্লাহর সাথে এমন কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা যার স্বপক্ষে তিনি কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না'।[১৭] সেজন্য সাহাবা কিরাম (রা) ও তাবে'য়ীগণ ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি করতেন না, বরং তা থেকে দূরে থাকতেন। প্রখ্যাত তাবে'য়ী ইমাম আবদুর রহমান বিন্ আবি লায়লা আল্ কুফী (মৃত্যু ৮২ হিঃ) উল্লেখ করেন : 'আমি আনসারদের মধ্য হতে ১২০ জন সাহাবীকে পেয়েছি, যদি তাঁদেরকে কোন প্রশ্ন করা হতো তখন তাঁরা অন্যের কাছে যেতে বলতেন। এভাবে প্রশ্নকারীকে ঘুরে ঘুরে প্রথম জনের কাছে ফিরে আসতে হতো।'[১৮]

অন্য এক রিওয়ায়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, তাঁদের মধ্যে কেউ কোন হাদীস বর্ণনা করতে চাইলে তিনি ইচ্ছা করতেন যে, অন্য কেউ তাঁর পক্ষে এই কাজটি করে দিক।'[১৯]

এ প্রসংগে আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) ও আবদুলাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, (من أفتى عَلى كُلّ ما يسألُ فَهو مجنونٌ) যে ব্যক্তি প্রতিটি জিজ্ঞাসার ফাত্ওয়া প্রদান করে সে হলো একজন উন্মাদ।[২০] ইমাম শা'বী, ইমাম হাসান ইবন আবুল হাসান আল্ বাসরী ও ইমাম উসমান ইব্ন আসেম ইব্ন হাসিন আল্ কুফি উল্লেখ করেন :

(إنَّ أحدكم ليفتى فِي المسألة, ولووردت عَلى عمربنِ الخطَّابِ لجمع لها أهل بدرٍ)

'তোমাদের যে কেউ যে কোন মাসয়ালার ফাত্ওয়া দিতে চায়, অথচ যদি হযরত উমার (রা)-এর নিকটে কোন মাসয়ালা উত্থাপিত হতো তখন তিনি নিজে উত্তর না দিয়ে এর জন্য বদরী (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) সাহাবীদের একত্রিত করতেন, যেন তাঁরাই মাসয়ালাটির উত্তর প্রদান করেন'।[২১] ইমাম সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাহ আল্ কুফি উল্লেখ করেন :

(أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً) 'যাদের জ্ঞান অপরিপক্ক, একমাত্র তারাই ফাত্ওয়া প্রদানে দুঃসাহস দেখায়'।[২২]

---

১৭. সূরা আল্-আরাফ, আয়াত নং- ৩৩।
১৮. আল হাফিয আবু বাকর আহমাদ আল খাতীব আল্ বাগদাদী, আল্ ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, দারুল কুতুব আল্ ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত, ১৩৪৯ হিজরী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১২।
১৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৪৩৩।
২০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৪৩২-৪৩৩।
২১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৩৪।
২২. আল্ খাতীব আল্ বাগদাদী, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬৮।

এ প্রসংগে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন :

لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت يكون لهم المهنأ وعليَّ الوزر.

'যদি আলাহ তা'আলার পক্ষ হতে জ্ঞান বিনষ্ট হওয়ার ভয় না হতো তাহলে আমি ফাত্ওয়া প্রদান করতাম না। কেননা প্রশ্নকারীগণ বিনা পরিশ্রমে উত্তর পেয়ে গেলেও উত্তর প্রদানের দায়ভার আমার উপরই রয়ে যায়।'[২৩]

ইমাম শাফে'য়ী (রহঃ) কে একটি মাসয়ালা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি তার উত্তর দেন নি। এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আমি যখন জানবো চুপ থাকার মধ্যে না কি বেশি বেশি উত্তর দেওয়ার মধ্যে সাওয়াব হয়, তখনই আমি উত্তর দেব'।[২৪] এমনিভাবে ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল সম্পর্কে জানা যায়, তিনি অধিকাংশ সময়ে প্রশ্নের উত্তরে 'আমি জানি না' বলতেন। আসরাম (রহ) (মৃত্যু ২৭৩ হিঃ) উল্লেখ করেন : **سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يكثر أن يقول لا أدرى** 'আমি ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বলকে অধিকাংশ সময় মাসয়ালা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে **لاَ أدرِى** (আমি জানি না) বলতে শুনেছি'।[২৫]

হায়সাম ইব্ন জামিল (রহঃ) উল্লেখ করেন :

شهدت مالكا, سئل عن ثمان وأربعين مسألة, فقال اثنين وثلاثين منها لا أدرى

'আমি ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহ) কে দেখেছি যে, তাঁকে ৪৮টি মায়সালা জিজ্ঞাসা করা হলে তন্মধ্যে ৩২টি মাসয়ালার উত্তর প্রদানে **لاأدرِى** (আমি জানি না) বলেছেন'।[২৬] অনুরূপভাবে ইমাম মালিক (রহঃ) সম্পর্কে আরো জানা যায় যে,

أنه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة, فلايجيب فى واحدة منها, وكان يقول : من أجاب فى مسألة فينبغى قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه, ثم يجيب. وسُئل مالك عن مسألة,فقال لاأدرى, فقيل : هى مسألة خفيفة سهلة, فغضب وقال : ليس فى العلم شيئ خفيف.

ইমাম মালিক (রহ)কে কখনো পঞ্চাশটি মায়সালা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি একটি মাসয়ালারও উত্তর দেন নি। বরং বলেন : 'যে ব্যক্তি কোন মাসয়ালার উত্তর দিতে চায়, সে যেন প্রথমে নিজেকে জান্নাত ও জাহান্নামের সামনে পেশ করে এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের পথ বের করে নেয়, অতঃপর উত্তর প্রদান করে।' এভাবে আরেক দিন ইমাম মালিক (রহ.) কে একটি মাসয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি 'আমি জানিনা' বললেন। অতঃপর তাকে বলা হলো, এতো সহজ মাসয়ালা ছিল। এ কথা শুনে তিনি রেগে গেলেন এবং বললেন, 'জ্ঞানের ভেতর সহজ

---

২৩. মুফতি মুজাফফার হোসেন, উকুদু রাসমিল মুফতি, দেওবন্দ লাইব্রেরী, ১৪২১ হিজরী, পৃষ্ঠা- ৬।
২৪. ইবন হামাদান, আহমাদ বিন হামাদান আন্ নিমরী, ছিফাতুল ফাতওয়া ওয়াল মুফতী ওয়াল মুসতাফতী, আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, ১৩৭৭ হিজরী, পৃষ্ঠা-৬।
২৫. ইবন হামাদান, ছিফাতুল ফাত্ওয়া, পৃষ্ঠা-৮।
২৬. আল্ হাইসাম বিন জামিল, মুখতাছারু ইবনুল হাজিব, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা- ২৯০।

বলতে কিছুই নেই।'[২৭]

তাবে'য়ীদের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই তাঁদের অধিকাংশই হাদীস বর্ণনা ও সংরক্ষণের কাজে ব্যস্ড় ছিলেন। খুব কম সংখ্যক তাবে'য়ী ফাত্ওয়া প্রদানের কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁরা পবিত্র আল-কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এমন বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে কথা বলতেন না। ছোট খাটো মাসয়ালার ক্ষেত্রেও কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না। কারণ হলো নিজস্ব মতামত দ্বারা কোন বিষয়ে ফাত্ওয়া দিতে ভয় পেতেন। তবে যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকুরই সমাধান দিতে চেষ্টা করতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা মু'য়ায ইব্ন জাবাল (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকেই বেশি স্মরণ করতেন। মু'য়ায ইব্ন জাবাল বর্ণনা করেন,

(عن وهب بِن عمرو الجمحى أن النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : لا تعجلوا بِالبلِيَّة قبل نزولها لاينفكُّ المسلمون وفيهِم اذا هى نزلت من إذا قال : وفِّقَ وسدِّدَ و إنَّكم إن تعجلوها تختلف بِكم الأهواء, فتأخذوا هكذأ, وأشار بينَ يديه وعن يمينِه وعن شماله)

'ওয়াহাব বিন আমর আল্ জুমাহী (রা) বর্ণনা করেন : প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন : তোমরা সমস্যা প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে সমাধানে তরান্বিত হয়ো না, কেননা, তা মুসলিমদেরকে রক্ষা করতে পারে না। এবং যখন সমস্যা আবর্তিত হয় তখন যে জিজ্ঞাসিত হলো সে আবদ্ধ হয়ে গেলো, আর যদি তোমরা সমস্যা সমাধানে তাড়াতাড়ি কর তাহলে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেবে, তখন তোমরা কেউ এটা কেউ ওটা গ্রহণ করবে। এবং তিনি দুই হাত দিয়ে ডান দিকে ও বাম দিকে ইঙ্গিত করলেন'।[২৮] এ ক্ষেত্রে তাঁরা উমার (রা), আলী (রা), আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) এর উক্তি **كراهية التكلم فيما لم ينزل** (অর্থাৎ অনাগত বিষয়ে আলোচনা অপছন্দনীয়) মনে রেখে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ফাত্ওয়া প্রদান করতেন না। অযথা সিদ্ধান্ত দিতেন না।[২৯]

উপরের আলোচনায় আমরা যে বিষয়াদি উপলব্ধি করেছি, তা হলো আমাদের পূর্বসূরীরা, সম্মানিত সাহাবা কিরাম, তাবে'য়ীগণ ও ইমামগণ সহজে ফাত্ওয়া দিতে চাইতেন না। ফাত্ওয়া দিতে ভয় পেতেন। শুধু ইল্ম হারিয়ে যাওয়ার আশংকায় এবং আলাহর নিকট জবাবদিহির ভয়ে প্রয়োজন মাফিক যতটুকুর প্রয়োজন ততটুকুরই ফাত্ওয়া প্রদান করতেন। আর কোন কিছু জানা না থাকলে সরাসরি 'আমি জানি না' বলে উত্তর দিয়ে দিতেন।

ফাত্ওয়ার ভিত্তি

ইবন কুদামাহ সর্বসম্মত ঐকমত্যের ভিত্তিতে উল্লেখ করেন যে, যিনি ফাত্ওয়া দেবেন তিনি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য দলীল দ্বারা ফাত্ওয়া দেবেন। দলীলের মধ্যে যেটা অগ্রাধিকারযোগ্য সেটাকে প্রথমে গ্রহণ করবেন। এরপর ধারাবাহিকভাবে বাকিগুলোর

---

২৭. প্রাগুক্ত।
২৮. ইমাম আদ দারেমী, সুনানুদ দারেমী, খণ্ড :১, পৃষ্ঠা- ৪৬,৫২।
২৯. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, হুজ্জাতিল্লাহিল বালেগা, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪৭।

আশ্রয় নেবেন। যেমন মুফতীকে প্রথমে আলাহর কিতাব আল-কুরআন থেকে দলীল তালাশ করতে হবে। যদি তিনি সেখানে কোন প্রমাণ না পান তাহলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহতে তালাশ করবেন। যদি সেখানেও কিছু না পান তাহলে ইজমা'র দলীলের দিকে যেতে হবে। যে সকল দলীলে মতভেদ রয়েছে সেক্ষেত্রে তিনি ইজতিহাদ করবেন। তাঁর ইজতিহাদে যে দলীল সঠিক বলে মনে হবে সেটা দ্বারাই ফাত্ওয়া দেবেন। যদি তাঁর সামনে বিভিন্ন দলীল উপস্থিত হয় তাহলে যেটা অগ্রাধিকার যোগ্য এবং শক্তিশালী সেটা দ্বারাই ফাত্ওয়া দেবেন। তিনি আরো বলেন : যে কোন মুজতাহিদের মতানুযায়ী তাঁর ফাত্ওয়া দেওয়ার অধিকার নেই, যতক্ষণ না তাঁর ইজতিহাদ সেটাকে সঠিক মনে করে। যে দলীল দুর্বল বা যা অগ্রাধিকারযোগ্য নয় তা দ্বারা ফাত্ওয়া দেওয়ার অধিকার তাঁর নেই।[৩০] সেভাবে যিনি মুকালিদ (কোন মাযহাবের অনুসারী) তিনিও ফাত্ওয়া দিতে পারেন। তিনি ফাত্ওয়া দেবেন মুজতাহিদদের বিভিন্ন মতামতের মধ্যে যেটা তাঁর জন্য সত্য উদঘাটনে ও ব্যাখ্যা দানে সহজ হয় সেটা দ্বারা। এক্ষেত্রে কে বড় আলিম কে বেশি জানেন কে সবচেয়ে ভাল তালাশ করা তাঁর প্রয়োজন নেই। তবে যে সকল মাসয়ালায় মতভেদ রয়েছে সেখানে যেটা বেশি সঠিক বলে মনে হবে, অগ্রাধিকারযোগ্য বলে মনে হবে, সেটাই গ্রহণ করতে হবে। সেটা দ্বারা ফাত্ওয়া দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম নাবাবী বলেন : 'কোন মুফতী ও আমলকারীর জন্য উচিৎ হবে না কোন মাসয়ালার একাধিক মতের মধ্যে যেটা খুশি সেটা দ্বারা ফাত্ওয়া দেওয়া বা আমল করা বরং যেটা অগ্রাধিকারযোগ্য সেটা দ্বারাই ফাত্ওয়া দেবেন এবং আমল করবেন।'[৩১]

যদি কোন মুফতী তাঁর ফাত্ওয়ার দলীল হাদীস থেকে নেন তাহলে অবশ্য তাঁকে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানতে হবে। যদি তিনি হাদীসবিশারদ হন তাহলে তিনি নিজেই এর বিশুদ্ধতা নিরুপণ করবেন। আর যদি হাদীসবিশারদ না হন তাহলে অন্যের শরণাপন্ন হবেন। আর যদি কোন মুজতাহিদের কথার ওপর ভিত্তি করে ফাত্ওয়া দেন (যারা এটাকে বৈধ মনে করেন তাদের মতানুযায়ী) সে ক্ষেত্রে ইজতিহাদের ভিত্তি উপস্থাপন করবেন। আর তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে তাকে সুপরিচিত সুপ্রসিদ্ধ বই পুস্ড়ক যেগুলো সচরাচর উলামা-মাশায়েখগণ পড়াশুনা করেন, আলোচনা করেন, সেগুলো হতে ফাত্ওয়া দেবেন।[৩২]

ফাত্ওয়া দানের যোগ্যতা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যিনি ফাত্ওয়া প্রদান করেন, ফাত্ওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকেন তাঁকে মুফতী বলা হয়। মুফতী সকলে হতে পারেন না। মুফতী হওয়ার জন্য অনেকগুলো শর্ত রয়েছে। ফিকাহ্ বিশারদগণ এসকল শর্ত তাঁদের বিভিন্ন পুস্তকাদিতে

---

৩০. ইবন কুদামাহ ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, রাওদাতুন নাযির ওয়া জুন্নাতুল মুনাযির, জামিয়া ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ, রিয়াদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ৪৩৮।

৩১. ইমাম নাবাবী আল হাফিজ ইয়াহইয়া ইবন শারফ আন নাবাবী, আল্ মাজমু শারহুল মুহায্যাব, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৮।

৩২. প্রাগুক্ত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭।

নির্ধারণ করেছেন। সেখান থেকেই এগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল।

প্রথম শর্ত : মুফতীকে মুসলিম হতে হবে। অমুসলিমের ফাত্ওয়া প্রদান বৈধ নয়।

দ্বিতীয় শর্ত : তাঁর বিবেক বুদ্ধি (আকল) থাকতে হবে। পাগলের ফাত্ওয়া প্রদান বৈধ নয়।

তৃতীয় শর্ত : বালেগ হতে হবে। নাবালগের ফাত্ওয়া সঠিক নয়।

চতুর্থ শর্ত : মুফতীকে ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক ও পুণ্যবান হতে হবে।

অধিকাংশ উলামার নিকট ফাসিক পাপাচারীর ফাত্ওয়া বৈধ নয়। কেননা ফাত্ওয়া প্রদান হলো ইসলামী শারী'য়াতের বিধান সম্পর্কে অবহিত করা। পক্ষান্তরে ফাসিকের তথ্য, সংবাদ কিংবা মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কতিপয় উলামা ফাসিকের ফাত্ওয়া তাঁর নিজের জন্য গ্রহণযোগ্য বলে মত দিয়েছেন। কেননা তিনি নিজ সত্য সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছেন।[৩৩]

হানাফী মাযহাবের কতিপয় উলামা মত দিয়েছেন যে, ফাসিক মুফতী হতে পারবেন। কেননা তিনিও ইজতিহাদ[৩৪] করার অধিকার রাখেন। তবে তাঁর ইজতিহাদ নির্ভুল হতে হবে।[৩৫] এ প্রসঙ্গে ইমাম ইব্নুল কাইয়্যেম উল্লেখ করেন : ফাসিকের ফাত্ওয়া প্রদান বৈধ, কিন্তু যখন তাঁর অন্যায় ও পাপ কাজ ব্যাপকতা লাভ করবে তখন তাকে এ সম্পর্কে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে হবে। আর এটা এজন্য যে, ফাত্ওয়ার কাজ যেন বন্ধ না হয়ে যায়। মন্দের ভাল হিসাবে এটাকে গ্রহণ করা হয়েছে। যদি ন্যায়পরায়ণ মুফতী পাওয়া যায় তাহলে ফাসিকের দিকে যাওয়া যাবে না।[৩৬] আর যারা বিদ'য়াতপন্থি ফাসিক, যদি তাদের বিদ'য়াতগুলো কুফরী ও ফিসকের পর্যায়ে পড়ে তাহলে তাদের ফাত্ওয়া প্রদান বৈধ নয়। তা না হলে বৈধ হবে যদি তারা তাদের বিদ'য়াত কর্মের দিকে অন্যকে আহবান না করে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আল খাতিব আল্ বাগদাদী (রহঃ) বলেন : 'যারা প্রবৃত্তির পূজারী এবং যাদেরকে আমরা কাফির ও ফাসিক বলি না তাদের ফাত্ওয়া প্রদান বৈধ। তবে যারা সাহাবা কিরাম (রা) ও আমাদের পূর্বসূরীদেরকে গালি গালাজ ও তিরষ্কার করে তাদের ফাত্ওয়া বৈধ নয়।'[৩৭]

পঞ্চম শর্ত : ইজতিহাদ করার যোগ্যতা থাকতে হবে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন:

(قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وِمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْىَ بَغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْ بِاللهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِه سُلْطنًا وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ).

'হে নবী! আপনি বলে দিন : নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল

---

৩৩. আহমাদ ইবন হামাদান আন্ নিমরী, ছিফাতুল ফাত্ওয়া ওয়াল মুফতী ওয়াল মুসতাফ্তী, পৃষ্ঠা-২৯।

৩৪. ইজতিহাদ হলো উপযুক্ত দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা ইসলামী শারী'য়াতের বিধি-বিধান উদঘাটন ও উদ্ভাবন করার যোগ্যতা।

৩৫. মাজমায়ূল আনহুর ফি শারহি মুল্তাকাল্ আবহুর, আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আফিনদি দারু ইয়াহইয়াউত্ তুরাসিল্ আরাবী, বৈরুত, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪৫।

৩৬. ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২২০।

৩৭. আল খাতীব আল্ বাগদাদী, আল্ ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, পৃষ্ঠা- ২০২।

বিষয়সমূহ হারাম করেছেন। আরো হারাম করেছেন গুনাহর কাজ, সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি, আলাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা যার স্বপক্ষে তিনি কোন সনদ নাযিল করেন নি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না।'[৩৮]

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিনি ফাত্ওয়া প্রদান করেন তিনি বস্তুতঃ আল্লাহর পক্ষ হতেই কথা বলে থাকেন। অতএব যিনি মুফতী হবেন তাঁর অবশ্যই ইজতিহাদ করার যোগ্যতা থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফে'য়ী (রহঃ) বলেন : 'আল্লাহর দীন সম্পর্কে কারো ফাত্ওয়া প্রদান বৈধ নয় যতক্ষণ না সে পবিত্র আল্ কুরআন সম্পর্কে পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করে।' অর্থাৎ পবিত্র আল্-কুরআনের নাসিখ, মানসুখ, মুহকাম, মুতাশাবিহ, তাফসীর, শানে নূযুল, মাক্কী আয়াত, মাদানী আয়াত ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন না করে। ইমাম শাফে'য়ী (রহঃ) আরো বলেন : 'অনুরূপভাবে তাঁকে পবিত্র আল্-কুরআনের মত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস সম্পর্কেও জানতে হবে। সাথে সাথে তাঁকে আরবী ভাষা, সাহাবা কিরাম (রা) ও পূর্বসূরীদের জীবন-চরিত সম্পর্কে জানতে হবে। শহরবাসীদের বিভিন্ন আচার-আচরণ ও মতভেদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হবে। মোটকথা উপরোক্ত বিষয়সমূহে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। তাহলেই তিনি আলাহর দীন সম্পর্কে কথা বলতে পারেন। হালাল-হারাম সম্পর্কে ফাত্ওয়া দিতে পারেন। তা না হলে তাঁর ফাত্ওয়া দেওয়ার অধিকার নেই। আর এটাই হলো ইজতিহাদের অর্থ। ইমাম ইব্নুল কাইয়্যেম ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল থেকে ইজতিহাদ সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য বর্ণনা করেন।[৩৯] উপরোক্ত বক্তব্য অনুযায়ী যাঁরা তাকলীদ করেন অর্থাৎ কোন ইমামের মাযহাবকে অনুকরণ করেন কিন্তু ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখেন না তাঁদেরও স্বীয় ইমামের মতামতকে নকল করে ফাত্ওয়া দেওয়া বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইব্নুল কাইয়্যেম বলেন : মুকালিদের (মাযহাব অনুকরণকারীর) ফাত্ওয়া যদি তিনি অন্যের রায় বা মতামত দিয়ে ফাত্ওয়া দেন, তার সম্পর্কে তিনটি মত পাওয়া যায়।

(ক) তাকলীদ দ্বারা ফাত্ওয়া অর্থাৎ অন্যের মত বা বক্তব্য দিয়ে ফাত্ওয়া দেওয়া বৈধ নয়। কেননা এটা কোন জ্ঞান নয়। আর যিনি এভাবে ফাত্ওয়া দেন তিনি আলিম নন। ইল্ম ছাড়া ফাত্ওয়া প্রদান বৈধ নয়।

(খ) নিজ সম্পর্কিত কোন বিষয় হলে তাকলীদ দ্বারা ফাত্ওয়া বৈধ। অর্থাৎ তিনি নিজের জন্য এ ধরনের ফাত্ওয়া দিয়ে আমল করতে পারেন। তবে তাকলীদ দ্বারা অন্যকে ফাত্ওয়া প্রদান করতে পারেন না।

(গ) যদি কোন মুজতাহিদ আলিম না পাওয়া যায়, তাহলে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এ ধরনের ফাত্ওয়া প্রদান বৈধ।[৪০]

---

৩৮. সূরা আল্ আরাফ, আয়াত নং- ৩৩।
৩৯. ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন আন রাব্বিল আলামীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৬।
৪০. প্রাগুক্ত।

এ ক্ষেত্রে আবার ভিন্ন মত পোষণ করে আলামা ইব্নু দাকীক আল ঈ'দ উল্লেখ করেন : 'ফাত্ওয়ার বিষয়টি মুজতাহিদ পাওয়ার উপর নির্ধারণ করলে বড় ধরনের অসুবিধা দেখা দেবে অথবা জনসাধারণকে তাদের প্রবৃত্তির খেয়াল খুশীর দিকে ধাবিত করবে। অতএব, উত্তম হলো ফাত্ওয়া প্রদানকারী যদি পূর্ববর্তী ইমামদের কথা বুঝে শুনে সততার সাথে ফাত্ওয়া তলবকারীর নিকট পেশ করেন তাতে কোন অসুবিধা নেই। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সময়ে এ ধরনের ফাত্ওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছে।'[৪১]

মোটকথা কোন মুফতী যদি তাঁর মাযহাবের ইমামের মতানুসারে ফাত্ওয়া প্রদান করেন অথচ সে মতের দলীল প্রমাণ সম্পর্কে তাঁর জানা নেই অথবা মাসয়ালা উদঘাটনের তাঁর যোগ্যতা নেই তাহলে তিনি ফাত্ওয়া প্রদানের যোগ্যতা রাখেন না। সুতরাং তাঁর ফাত্ওয়া বৈধ হবে না।

হানাফীদের সবচেয়ে সঠিক মত হলো– মাযহাবের মুজতাহিদ হলেন ঐ সকল উলামা মাশায়েখ যাঁদের মতামত প্রাধান্য পেয়ে থাকে। নির্দিষ্ট মাযহাবের ইমামের মতামতকে বিনা বাক্যে– যাচাই বিহীন গ্রহণ করা আবশ্যিক নয়। বরং তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে দলীল প্রমাণের দিকে। যেটার দলীল শক্তিশালী হবে সেটাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে পূর্ব থেকে যে ইমামের কথা গ্রহণ করে আসছিল তাঁর মতামতকে গ্রহণ করতে হবে। যখন যা ইচ্ছা তা গ্রহণ করার অধিকার তাঁর নেই।[৪২]

উপর্যুক্ত কথাগুলো থেকে যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয়েছে তাহলো হানাফী, শাফে'য়ী ও হাম্বালী মাযহাবে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, কোন বিষয়ের দুইটি মতামতের যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার মুফতীকে দেওয়া হয় নি। বরং তাঁকে দেখতে হবে কোনটির দলীল বেশি শক্তিশালী বা গ্রহণের উপযোগী সে অনুযায়ী তাঁকে আমল করতে হবে। অতএব, যদি তিনি ইজতিহাদের দ্বারা জানতে পারেন যে, তাঁর স্বীয় মাযহাবের ইমামের মতামতের চেয়ে অন্য মত সঠিক, তাহলে তাঁকে সেই মত অনুযায়ী ফাত্ওয়া প্রদান করতে হবে।[৪৩]

উপরোক্ত তিন মাযহাবের নিকট কোন মুকালিদ (মাযহাব অনুকরণকারী) মুফতীর দুর্বল ও অপ্রধান মতামত দ্বারা ফাত্ওয়া প্রদান উচিত নয়, বরং দুর্বল ও অপ্রধান মতামত অনুযায়ী আমল করা মূর্খতা ও ঐকমত্যের বিরোধী।[৪৪]

ষষ্ঠ শর্ত : মুফতীকে উত্তম মেধা ও স্বভাবের অধিকারী হতে হবে।

তবেই তিনি অধিক সঠিক ফাত্ওয়া দিতে পারবেন, সুষ্ঠুভাবে মাসয়ালা উদঘাটন করতে পারবেন। সুতরাং নির্বোধ, বোকা ও অজ্ঞ লোকের মুফতী হওয়া সঠিক নয়। যিনি বেশি ভুল করেন তাঁরও মুফতী হওয়ার যোগ্যতা নেই।

---

৪১. ইমাম বাদরুদ্দিন মুহাম্মাদ আয্ যারকাশী, আল বাহরুল মুহীত, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা- ৩০৬।
৪২. মুহাম্মাদ আমিন ইবন উমার ইবন আবেদীন, হাশিয়াতু ইবনুল্ আবেদীন, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩০২।
৪৩. ইবনু কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন আন রাব্বিল আলামীন, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা- ২৩৭।
৪৪. মুহাম্মাদ আমিন ইবন উমার ইবন আবেদীন, হাশিয়াতু ইবনুল্ আবেদীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫১।

বরং স্বভাবগতভাবে তাঁকে শারী'য়াতের দলীল-প্রমাণাদি, হুকুম আহকাম ও অন্যান্য উদ্দেশ্যাবলী দ্রুত ও সঠিকভাবে বুঝতে ও তদনুযায়ী মীমাংসা করতে সক্ষম হতে হবে।

সপ্তম শর্ত : মুফতী হওয়ার জন্য আরেকটি যোগ্যতা হলো তাঁকে খুব সচেতন ও বিচক্ষণ হতে হবে।

মানুষের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ হতে হবে। কেননা কিছু লোক এমন আছে যারা প্রতারণা ও ধোঁকার মাধ্যমে কথা পাল্টিয়ে দেওয়াসহ ভ্রান্ত বিষয়কে সঠিকের আবরণে প্রকাশ করার যথেষ্ট যোগ্যতা রাখে। মুফতীর অমনোযোগিতা ও অসচেতনতা এতে বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইব্নুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন : 'মুফতীর জন্য অবশ্য উচিত হবে মানুষের ধোঁকা, প্রতারণা এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া। যদি তা না হয় তাহলে তিনি নিজে পথভ্রষ্ট হবেন এবং অন্যকে পথভ্রষ্ট করবেন। মুফতী যদি মানুষের অবস্থা জানতে পারদর্শী না হন তাহলে তাঁর নিকট যালিম মাযলুমের কিংবা মাযলুম যালিমের আকৃতিতে প্রকাশিত হবে।'[৪৫] এ বিষয়ে কতিপয় উলামা সতর্কতামূলক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 'মুফতী হতে হলে তাঁকে অবশ্যই ফাত্ওয়া তলবকারীর ভাষা ও শব্দ চয়ন সম্পর্কে পারদর্শী হতে হবে। যাতে তিনি উল্টোটা বুঝে ফাত্ওয়া না দেন। বিশেষ করে কসম ও স্বীকারোক্তির ভাষার ক্ষেত্রে।'[৪৬]

পরিশেষে, মুফতী হওয়ার জন্য স্বাধীন, পুরুষ, কানে শুনা, চোখে দেখা, কথা বলতে পারা জরুরী নয়। ক্রীতদাস, নারী, বধির, কানা ও বোবাও ফাত্ওয়া দিতে পারেন যদি তাঁরা লিখতে পারেন অথবা তাঁদের ইশারা ইঙ্গিত বুঝা যায়।[৪৭] ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল উল্লেখ করেন : কেউ নিজেকে মুফতী হিসাবে ঘোষণা দিতে পারবেন না এবং যিনি মুফতী হবেন তাঁকে অবশ্যই পাঁচটি গুণের অধিকারী হতে হবে। (ক) তাঁর বিশুদ্ধ নিয়াত থাকতে হবে। যদি নিয়াত ঠিক না হয় তাহলে সেখানে নূর অর্থাৎ আলো আসে না। (খ) তাঁর ইল্ম, সহিষ্ণুতা, গাম্ভীর্য ও স্থিরতা থাকতে হবে। (গ) ইলমের মধ্যে গভীরতা ও শক্ত ভিত্তি থাকতে হবে। (ঘ) যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকতে হবে যাতে তিনি অন্যের সাহায্য ছাড়াই সমাধান দিতে পারেন এবং (ঙ) মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতে হবে। কারণ যাঁরা মানুষের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ তাঁরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফাত্ওয়া প্রদানে ভুল করেন।[৪৮] ■

---

৪৫. ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন আন্ রাব্বিল আলামীন, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০৫।
৪৬. ইমাম নাবাবী, আল মাজমু শারহুল মুহায্যাব, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা- ৪১।
৪৭. ইমাম নাবাবী, মুকাদ্দামাতু শারহিল মুহায্যাব, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা- ৬৯।
৪৮. প্রাগুক্ত।

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে অপহরণ

মীযানুল করীম

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণ করা হয়েছে। তিনি সামান্য ট্রাক ড্রাইভার থেকে একেবারে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। তার নেতা ছিলেন জনপ্রিয় সাবেক প্রেসিডেন্ট। নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণ করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে নাকি তার বিচার হবে। তাকে সাধারণ কয়েদির সাথে রাখা হয়েছে। হাতে হাত কড়া পরানো ছবি পত্রিকায় উঠেছে। ইরান ও উত্তর কোরিয়ার বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। এছাড়াও মার্কিন বিরোধী রাষ্ট্রগুলোর বন্ধু ছিলেন। এটাই তার আসল দোষ। তাকে অপহরণের কথা পানামার ওমর টোরিজোমকে মনে করিয়ে দেয়।

ভেনেজুয়েলা ক্যারিবিয়ান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বড় হিসেবে গণ্য। এর রাজধানী কারাকাস। নগর হিসেবে ঢাকার দ্বিগুণ। ভেনেজুয়েলার আয়তন ৯ লক্ষ বর্গ মাইলের বেশি। দেশটি তেল সমৃদ্ধ এবং এখানে ওভিয়েদো, বলিভার, ভালেন্সিয়া সহ আরো দশ বারটি শহরের নাম শুনা যায়। সায়মন বলিভার ছিলেন জাতির নেতা। ১৮৩০ সালের দিকে তিনি মারা যান। তাঁর নামে বলিভার শহরের নাম করা হয়।

ভেনেজুয়েলার অন্তবর্তী প্রেসিডেন্ট

ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের খবরদারি সহ্য করেছেন। এখনো করছেন। রাজনীতিকরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করবেন।

জানুয়ারীর শুরুতে ভেনেজুয়েলার সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে তুলে নিয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র। এরপর ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর একধরণের কঠিন পরিস্থিতি পার করছেন রদ্রিগেজ। মাদুরোর অনুগত নেতাদের সমর্থন ধরে রাখা, হোয়াইট হাউসকে খুশি রেখে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন।

দায়িত্ব নেওয়ার এক মাস পার না হতেই যুক্তরাষ্ট্রকে পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন তিনি। পুয়ের্তো লা ক্রুজ শহরে তেল শ্রমিকদের অনুষ্ঠানে ভাষণে রদ্রিগেজ বলেন, 'ভেনেজুয়েলার রাজনীতিবিদদের ওপর ওয়াশিংটনের খবরদারি হয়েছে। ভেনেজুয়েলার রাজনীতিই মতপার্থক্য ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সমাধান করুক। ফ্যাসিবাদ ও উগ্রবাদের মোকাবিলা করতে গিয়ে এই প্রজাতন্ত্রকে উচ্চ মূল্য দিতে হয়েছে।'

মাদুরো সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন রদ্রিগেজ। তিনি বলে আসছেন ভেনেজুয়েলাকে যুক্তরাষ্ট্র চালায় না। আবার ওয়াশিংটনের সঙ্গে কোনো সংঘাতেও জড়াতে চান না তিনি।

কে চালাচ্ছেন ভেনেজুয়েলা:

ভেনেজুয়েলায় রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের একটি ছোট শক্তিশালী গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে দেশটির ক্ষমতার লাগাম ধরে রেখেছে। তাদের বিশ্বস্ত একদল অনুসারী রয়েছে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর এক বড় অংশের সমর্থনও রয়েছে।

মার্কিন বাহিনী অভিযান চালিয়ে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে নিউইয়র্কে তুলে নিয়ে যাওয়ার পরও দেশটিতে শক্তিশালী ওই গোষ্ঠী ক্ষমতার কেন্দ্রে রয়ে গেছে। ক্ষমতাশালী এ গোষ্ঠীতে কে কে আছেন, যুক্তরাষ্ট্রের কোন্ কোন্ কর্মকর্তাই-বা ভেনেজুয়েলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ভূমিকা রাখছেন এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজেছে রয়টার্স।

ভেনেজুয়েলার ভেতরে যাঁরা প্রভাব রাখছেন

মাদুরোর ভাইস প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট। ৩ জানুয়ারী মাদুরোকে সস্ত্রীক তুলে নিয়ে যাওয়ার পর ৬ জানুয়ারী অন্তবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি শপথ নেন। যুক্তরাষ্ট্রের নজর দারিতে রদ্রিগেজ এখন দেশ পরিচালনা করছেন। রদ্রিগেজ অভিজ্ঞ আইনজীবী। দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিতে যুক্ত ও দলীয় প্রভাবশালী নেতা হিসেবে কাজ করছেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট, তেলমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এই নারী ভেনেজুয়েলার অর্থনীতিতে 'সারিনা' নামে পরিচিত। মাদুরো সরকারের অংশ হওয়ার কারণে দেলসি যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছেন; তবে তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার্কিন প্রশাসনের বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

জর্জ রদ্রিগেজ

জর্জ রদ্রিগেজ প্রেসিডেন্ট দেলসির ভাই। জর্জ ২০২১ সাল থেকে ভেনেজুয়েলার জাতীয় পরিষদের প্রধান, যেখানে মাদুরোর দল ইউনাইটেড সোশ্যালিস্ট পার্টি অব ভেনেজুয়েলা (পিএসইউভি) সংখ্যাগরিষ্ঠ। জর্জ রদ্রিগেজ মাদুরো সরকারের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিরোধীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছেন। তিনি অতীতে নির্বাচনের শর্ত নির্ধারণ এবং বন্দী মুক্তির আলোচনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। আশা করা হচ্ছে, জর্জ রদ্রিগেজ ভেনেজুয়েলায় তেল আইন সংশোধনের উদ্যোগে নেতৃত্ব দেবেন; যাতে আরও বিদেশি কোম্পানি কার্যক্রম চালাতে পারে।

দিও সদাদো কাবেলো

দিওসদাদো কাবেলো ভেনেজুয়েলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। যুক্তরাষ্ট্র কাবেলোকে নিয়ে চিন্তিত। তাঁকে ভয় করার কারণ রয়েছে। কাবেলো ভেনেজুয়েলার মিলিটারি কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি ও কথিত মোটর সাইকেল বাহিনী 'কালেক্টিভোস'- এর উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছেন। কাবেলোকে বিরোধীদের দমনমূলক কার্যক্রমের ভেনেজুয়েলায় প্রধান হিসেবে দেখা হয়। কাবেলোর বিরুদ্ধেও যুক্তরাষ্ট্রে 'নারকো-টেররিজম' বা মাদক সন্ত্রাসের অভিযোগে মামলা রয়েছে। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য ২ কোটি ৫০ লাখ ডলারের পুরষ্কারও ঘোষণা করা আছে।

ভ্লাদিমির পাদ্রিনো

ভ্লাদিমির পাদ্রিনো ভেনেজুয়েলার প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তিনি দেশটির সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের মতে, দেশটিতে রূপান্তরের সময়ে ক্ষমতার শূন্যতা এড়াতে পাদ্রিনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাদ্রিনো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাবেলোর মতো কট্টর পন্থী নন। তিনি দেলসি রদ্রিগেজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মাদক পাচারের মামলা এবং তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য ১ কোটি ৫০ লাখ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের মধ্যে যাঁদের ভূমিকা:

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও কিউবান বংশোদ্ভূত আমেরিকান। স্প্যানিশভাষী রুবিও দীর্ঘদিন ধরেই লাতিন আমেরিকা নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন। মাদুরোকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে বহুদিন কাজ করছেন তিনি। অভিযান চালিয়ে মাদুরোকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তিনি বলেছেন, পরবর্তী লক্ষ্য হতে পারে কিউবা সরকার। ভেনেজুয়েলার যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে কাজ করা নিশ্চিত করতে রুবিও সরাসরি অন্তবর্তী প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (সিআইএ) পরিচালক জন র‍্যাটক্লিফ। কয়েক মাস ধরে যাঁরা নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের মূল দশের একজন র‍্যাটক্লিফ। রয়টার্স বলেছে, মাদুরোকে ভেনেজুয়েলা থেকে ধরে নিয়ে আসতে যুক্তরাষ্ট্র যে সামরিক অভিযান চালিয়েছে; সেখানে সিআইএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

মাদুরোকে ধরে নিয়ে আসাসহ বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ক্যারিবীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি, মাদক পাচার করছে সন্দেহে নৌযানের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়ে মাদুরোকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পেছনে হেগসেথ কলকাঠি নেড়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি মন্ত্রী ক্রিস রাইট। যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক জ্বালানিনীতি তিনিই নির্ধারণ করেন। ভবিষ্যতে ভেনেজুয়েলার তেলশিল্প খাতের বাণিজ্য কেমন হবে, তা নির্ধারণে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। ট্রাম্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর উপর ভেনেজুয়েলার তেল খাত পুনর্গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

ভেনেজুয়েলার তেলের রাজস্ব নিয়ে, নতুন নির্দেশে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সই

ভেনেজুয়েলার তেল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসা রাজস্ব নিয়ে নতুন নির্দেশ দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ওই রাজস্ব থেকে আদালত ও ভেনিজুয়েলার পাওনাদারদের 'বিরত' রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। জরুরি নির্দেশ জারি করে বলা হয়েছে, জমা থাকা সমস্ত অর্থ ভেনেজুয়েলার শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

নতুন নির্দেশে কোনো বিশেষ সংস্থার নাম উল্লেখ না করেই জানানো হয়েছে, সরকারি ও কূটনৈতিক স্বার্থেই ভেনেজুয়েলার সম্পত্তি রাখা হয়েছে মার্কিন কোষাগারে। তাই ব্যক্তিগত দাবিদারদের কোনো প্রসঙ্গ থাকছে না। হোয়াইট হাউসের দাবি, ট্রাম্প এই পদক্ষেপ না নিলে ভেনেজুয়েলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারত।

প্রায় ২০ বছর আগে এক্সন মোবিল ও কনকোফিলিপস দু'টি কোম্পানির সম্পত্তি জাতীয়করণ হওয়ার পরে তারা ভেনেজুয়েলা ছেড়েছিল। তাদের পাওনা এখনো কয়েক শ' কোটি ডলার। ভেনেজুয়েলার তেল শিল্পে ১০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়ে ট্রাম্প বৈঠকে বসেছিলেন এক্সন, কনকো-সহ একাধিক সংস্থার সাথে। সেই দিনই তিনি তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশও জারি করলেন।

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন প্রেসিডেন্টের পদক্ষেপ বন্ধে সিনেট:

ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পদক্ষেপ গ্রহণ বন্ধে সিনেটে একটি প্রস্তাব করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, এই সংকটাপন্ন দেশে মার্কিন তদারকি বছরের পর বছর চলতে পারে।

যুদ্ধক্ষমতা সংক্রান্ত এ প্রস্তাব (ওয়ার পাওয়ারস রেজল্যুশন) নিয়ে আলোচনার পক্ষে ৫২ ও বিপক্ষে ৪৭ জন সিনেটর। মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিজের রিপাবলিকান পার্টির কয়েকজন সদস্য ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এই প্রস্তাবের পক্ষে।

নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র কয়েক বছর ধরে ভেনেজুয়েলাকে তদারকি এবং বাজস্ব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ট্রাম্প কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের হুমকি থেকে সরে এসেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। কলম্বিয়ার বামপন্থী নেতা প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আগে 'অসুস্থ মানুষ' বলে অভিহিত করলেও এখন ওয়াশিংটন সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ভেনেজুয়েলায় অভিযান চালিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে কারাকাসের সেফ হোম থেকে তুলে নিউইয়র্কে নিয়ে যায়।

আমার নীতিই যথেষ্ট: মার্কিন প্রেসিডেন্ট

আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা না করার ঘোষণা দিয়ে প্রেসিডেন্ট বলেছেন, বিশ্বজুড়ে তাঁর আগ্রাসী নীতিগুলো নিয়ন্ত্রণে নিজস্ব নৈতিকতাই যথেষ্ট। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে আটকের পর উত্তেজনার মধ্যেই মন্তব্য করলেন তিনি।

এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমার আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োজন নেই। আমি মানুষকে আঘাত করতে চাই না। আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলা উচিত কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'বিষয়টি নির্ভর করে আন্তর্জাতিক আইনের সংজ্ঞা কিভাবে দিচ্ছেন তার উপর। তিনি পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে কঠোর শক্তি ব্যবহারের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ভেনেজুয়েলার এ ঘটনার পর মার্কিন প্রেসিডেন্টের মনোভাব আরও বেড়েছে। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলা 'পরিচালনা করবে এবং দেশটির বিশাল জ্বালানি তেলসম্পদ ব্যবহার করবে। তাঁর প্রশাসন ভেনেজুয়েলার অন্তবর্তী প্রেসিডেন্ট রদ্রিগেজকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা মতো না চললে রদ্রিগেজকেও মাদুরোর চেয়ে বড় মূল্য দিতে হতে পারে।

ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের নর্থওয়েষ্টার্ন ইউনিভার্সিটির-রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক ইয়ান হার্ড বলেন, লাতিন আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ইতিহাস করুণ। চিলি, নিকারাগুয়া বা হাইতির উদাহরণ টেনে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র অতীতে এভাবে হস্তক্ষেপ করেছে, পরে অনুশোচনা করতে হয়েঠে।

ভেঙে পড়েছে নিয়মভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে অপহরণের মধ্য দিয়ে কথিত 'নিয়মভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার অবসান ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এবং ইউরোপীয় মিত্রদের কার্যত নীরব ভূমিকা আন্তর্জাতিক আইন ও বহুপক্ষীয় ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

নিয়মভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা আসলে পশ্চিমা শক্তিগুলোর তৈরি একটি ধারণা, যা আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্য বাধকতার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। মূল বৈশিষ্ট্য হলো এর নিয়মগুলো বিশ্বের প্রায় সব দেশের জন্য প্রযোজ্য হলেও যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র পশ্চিমা দেশগুলোর ক্ষেত্রে তা শিথিল। গত কয়েক দশকে রাশিয়া, ইসরাইল ও অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে এই দ্বৈত মানদণ্ড স্পষ্টভাবে দেখা গেছে।

ভেনেজুয়েলার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র দেশটির তেল সম্পদের দিকে নজর দিয়েছে। সাবেক মনরো নীতিকে নতুনভাবে উপস্থাপন করে যুক্তরাষ্ট্র এখন পশ্চিম গোলার্ধকে একচেটিয়া প্রভাব বলয় হিসেবে দেখছে, যাকে বিশ্লেষকরা 'মনরো নীতি' নামে অভিহিত করেছেন। এই নীতির আওতায় ভেনেজুয়েলায় হস্তক্ষেপের পাশাপাশি ভবিষ্যতে কানাডা, মেক্সিকো এমনকি ডেনমার্কের অধীন গ্রিনল্যান্ডও যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের কেন্দ্রে আসতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

এ দিকে ইউরোপীয় দেশগুলো এই নতুন বৈশ্বিক ক্ষমতার খেলায় প্রান্তিক হয়ে পড়ছে। আফ্রিকায় ফ্রান্সের প্রভাব হ্রাস এবং ব্রিটেনের সীমিত ভূমিকা ইউরোপের দুর্বল অবস্থানকে আরো স্পষ্ট করছে। ন্যাটো চাপে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, বিশেষ করে যদি যুক্তরাষ্ট্র কানাডা বা ডেনমার্কের মতো মিত্র দেশের বিরুদ্ধে ও অবস্থান নেয়।

বিশ্লেষকরা বলছেন, বিশ্বব্যবস্থা উনিশ ও বিংশ শতকের শুরুর দিকের মতো প্রভাববলয়ভিত্তিক রাজনীতির দিকে যাচ্ছে। মধ্য প্রাচ্য, পূর্ব ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়ায় বড় শক্তিগুলোর মধ্যে নতুন করে প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে পড়তে পারে এবং ভবিষ্যতে একটি নতুন আন্তর্জাতিক সমঝোতা বা আধুনিক ইয়াল্টা সম্মেলন এর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে বলে মত দিয়েছেন পর্যবেক্ষকরা।

বয়টার্স জানায়, জার্মানির প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক ভাল্টার স্টাইনমায়ার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিকে সমালোচনা করেছেন। তার মতে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্বে গৃহীত নীতি বিশ্বব্যবস্থাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। যদি এই ধারা অব্যাহত থাকে তবে পৃথিবী এমন এক অবস্থায় পৌঁছাবে যেখানে শক্তিশালী ও নিষ্ঠুর রাষ্ট্রগুলো ইচ্ছেমতো দেশ দখল করে নিবে। স্টাইনমায়ার এই পরিস্থিতিকে 'ডাকাতের আস্তানা' বলে অভিহিত করেন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিশ্বব্যবস্থা রক্ষায় এগিয়ে আসার আহবান জানান।

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করার ঘটনাকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র এখন এমন আক্রমণের মুখে পড়ছে যা আগে কখনো দেখা যায়নি। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তার অভিজ্ঞতা থেকে 'তিনি মনে করেন, বর্তমান সঙ্কট বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য বড় হুমকি।

যদিও জার্মানির প্রেসিজেন্টের ভূমিকা মূলত অনুষ্ঠানিক, তবুও তিনি রাজনৈতিক নেতাদের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারেন। স্টাইনমায়ার উল্লেখ করেন, ক্রিমিয়া রাশিয়ার অন্তর্ভুক্তি এবং ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার হামলা বিশ্বব্যবস্থায় প্রথম বড় ভাঙ্গন তৈরি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান আচরণ সেই ভাঙ্গনের দ্বিতীয় অধ্যায়।

এক সিম্পোজিয়ামে তিনি বলেন, 'আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার যুক্তরাষ্ট্র, যে দেশটি একসময় বিশ্বব্যবস্থা গঠনে সহায়তা করেছিল। সেই দেশই এমন নীতি নিচ্ছে যা বিশ্বকে অস্থিতিশীল করে তুলছে।' এখন প্রশ্ন হলো- আমরা কি পৃথিবীকে ডাকাতদের হাতে ছেড়ে দেব, যেখানে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো অন্য দেশকে নিজেদের সম্পত্তি মনে করে?"

জার্মানির সরকারি সম্প্রচারমাধ্যম এ আরভি প্রকাশিত' সর্বশেষ জরিপে দেখা গেছে, ৭৬ শতাংশ নাগরিক মনে করেন যুক্তরাষ্ট্র আর জার্মানির নির্ভরযোগ্য সহযোগী নয়।

২০২৫ সালের জুনের তুলনায় এ হার তিন শতাংশ বেড়েছে। জরিপে দেখা গেছে, মাত্র ১৫ শতাংশ মানুষ যুক্তরাষ্ট্রকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন, যা জরিপগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন।

তিন-চতুর্থাংশ জার্মান নাগরিক জানিয়েছেন, তারা ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের উপর আস্থা রাখতে চান। ৬৯ শতাংশ মানুষ ইউরোপের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ন্যাটোর সদস্য রাষ্ট্রগুলো এখন আর যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চয়তার উপর নির্ভর করতে পারছে না। স্টাইনমায়ারের বক্তব্য এবং সাম্প্রতিক জরিপ একসাথে ইঙ্গিত করছে যে, জার্মানিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আস্থা কমে যাচ্ছে এবং ইউরোপীয় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, আমেরিকা বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের বদলে তাদের সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে বিবেচনা করছে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি সতর্ক করে দেন যে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানের বাস্তব হুমকি এখনো শেষ হয়ে যায়নি। ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলার পর প্রেসিডেন্ট যখন কলম্বিয়াকেও অভিযানের লক্ষ্য বস্তু করার ইঙ্গিত দিয়েছেন, তখন থেকেই দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলায় কত দিন থাকবে, সময়ই বলে দেবে'

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে তুলে নেয়ার পর অন্তবর্তীকালীন নেতাদের সিদ্ধান্তে ছড়ি ঘোরাবে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির তেল বিক্রি 'অনির্দিষ্টকালের' জন্য নিয়ন্ত্রণও করবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রশাসন। ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

তিনি বলেছেন, ভেনেজুয়েলার উপর কত দিন মার্কিন সরাসরি তদারকি বজায় থাকবে, তা 'সময়ই বলে দেবে।'

তেলসমৃদ্ধ দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলার মার্কিন আধিপত্যের বিষয়ে প্রেসিডেন্ট এমন দাবি করলেও ভেনেজুয়েলার অন্যবর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ বলছেন, কারাবাসে বিদেশি শক্তি শাসন চালাচ্ছে না। মাদুরোকে তুলে নিতে মার্কিন হামলার বিষয়ে রদ্রিগেজ বলেন, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উপর এমন একটি কলঙ্কের দাগ পড়ে গেল, যা ইতিহাসে আগে কখনোই ঘটেনি।'

সম্প্রতি এক অভিযানে মার্কিন বাহিনী প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে যুক্তরাষ্ট্রে তুলে নিয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্র তাঁদের বিরুদ্ধে পাচারের অভিযোগ তোলে। বিচারের মুখোমুখি করতে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট ব্রিফিংয়ে বলেন, অন্তবর্তীকালীন কর্তৃপক্ষের উপর আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব রয়েছে।

লেভিট আরও বলেন, 'অন্তবর্তীশালীন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিভিড় সমন্বয় বজায় রাখছি এবং তাদের সব সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশেই পরিচালিত হতে যাচ্ছে।'

বৃহত্তম তেলের মজুত থাকা দেশ ভেনেজুয়েলা এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রই চালাবে বলে আগেই ঘোষণা দিয়েছেন। ওয়াশিংটনের কোনো স্থলবাহিনী সেখানে নেই। নৌ অবরোধ এবং সামরিক শক্তি ব্যবহারের হুমকি দিয়ে কারাকাসের উপর চাপ বজায় রাখরে ওয়াশিংটন।

কারাকাস জানিয়েছে, মার্কিন হামলায় অন্তত ১০০ জন নিহত হয়েছেন।

হাভানার দেওয়া তথ্যমতে, নিহতের তালিকায় কিউবার সামরিক বাহিনীর ৩২ সদস্য। মাদুরো তাঁর পূর্বসূরি হুগো শেভেজের মতোই কিউবার বিশেষায়িত সেনাদের দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন।

এদিকে আগের কয়েক দিনের মতো মাদুরোর সমর্থনে কারাকাসে বিক্ষোভ করেছেন হাজার হাজার মানুষ। এদিন প্রতিবেশী দেশ কলম্বিয়ায়ও বিক্ষোভ হয়েছে।

ভেনেজুয়েলা 'শাসন'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট এক ক্ষাৎকারে বলেন, তিনি প্রত্যাশা করছেন, এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রই ভেনেজুয়েলা পরিচালনা করবে। আগামী কয়েক বছর তেল সম্পদ ব্যবহার করবে। তিনি বলেন, দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির উপর কত দিন মার্কিন তদারকি সরাসরি বজায় থাকবে, তা 'সময়ই বলে দেবে'। এই সময়সীমা তিন মাস, ছয় মাস নাকি এক বছর– জবাবে তিনি বলেন 'আমি বলব, এর চেয়েও অনেক বেশি'।

যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত দেলসি রদ্রিগেজ ও নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মারিয়া কেরিনা মাচাদোসহ বিরোধী নেতাদের পাশ কাটিয়ে চলার ইঙ্গিত দিয়েছে। মাদুরো পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। আইন প্রণেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও দাবি করেন, 'যুক্তরাষ্ট্র হুট করে বা পরিকল্পনাহীন ভাবে কিছু করছে না।"

মার্কিন পরিকল্পনাটি প্রেসিডেন্টের দেয়া একটি বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, একটি চুক্তির আওতায় ভেনেজুয়েলা তিন কোটি থেকে তা পাঁচ কোটি ব্যারেল তেল যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেবে এবং পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্র বিক্রি করবে। তিনি বলেন, এই চুক্তির অধীনে তেলের লভ্যাংশ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে ভেনেজুয়েলা 'কেবল আমেরিকায় তৈরি পণ্য' ক্রয় করবে।

আমেরিকা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করছে। তিনি ইচ্ছা করলে ভেনেজুয়েলাকে মুক্ত রাখতে পারেন, ইচ্ছা করলে দখল করতে পারেন। আমেরিকায় প্রেসিডেন্টসিয়াল পদ্ধতি ও গণতন্ত্রের আর্দশ। মাদুরো গুরু হুগো শ্যেভেজের আমল থেকে ভেনেজুয়েলার সাথে আমেরিকার বিরোধ। তার পরিণতিতে মাদুরোকে অপহরণ করা হয়। ■

৫৮ নং পৃষ্ঠায়

মীম ট্যুরস বিজ্ঞাপন

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ ঃ নারীরা কি ঈদের সালাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে? জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

সাহিদা পারভীন, মীরপুর, ঢাকা

উত্তর ঃ জি, নারীগণ ঈদের সালাতে অংশ নিতে পারবেন। উলামায়ে কিরামও এ ব্যাপারে মত দিয়েছেন।

সালাত ও জুমু'আর জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য নারীদেরকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি প্রদান করেছেন। ঈদের সালাতে যাওয়ার জন্যও তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لاَ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ " لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا " .

"উম্মে আতীয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন মহিলাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় বের করে নিয়ে যাই পরিণত বয়স্কা, ঋতুবতী ও গৃহিনীসহ সবাইকে। তবে ঋতুবতী মহিলারা সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবে। বাকী পূণ্যের কাজে ও মুসলিমদের দু'আয় শরীক হবে।

(উম্মে আতীয়াহ রা. বললেন) আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো কারো বড় চাদর নাই। (উত্তরে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (যার ওড়না নেই) তার অন্য বোন তাকে নিজ চাদর বা অবগুণ্ঠন পরিয়ে দেবে। (সহীহ মুসলিম: ১৯৩৩)

প্রশ্ন-২ ঃ কখন ঈদের সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং কখন শেষ হয়।

মনিরুল ইসলাম, মতলব, চাঁদপুর

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে হাদীসে আছে,

عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم– يُصَلِّيْ بِنَا الْفِطْرَ وَالشَّمْسَ عَلَى قَيْدِ رَمْحَيْنِ وَالأَضْحَى عَلَى قَيْدِ رُمْحٍ

জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে ঈদুল ফিতরের সালাত আদায় করতেন সূর্য যখন দু' বর্শা পরিমাণ উপরে উঠত এবং ঈদুল আয্হার সালাত আদায় করতেন সূর্য যখন এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠত। (ফিকহুস সুন্নাহ : ১/৩১৯) **বিঃ দ্রঃ** এক বর্শাকে তিন মিটার ধরা হয়।

প্রশ্ন-৩ ঃ কোন্ কোন্ জায়গায় ঈদের সালাত আদায় করা যায়?

আবু আসলাম, কাপাসিয়া, গাজীপুর

উত্তর ঃ কোন একটা মাঠে তথা উন্মুক্ত জায়গায় অর্থাৎ ঈদগাহে ঈদের সালাত আদায় করা সুন্নাত। যাদুল মা'আদ কিতাবে ইবনুল কায়্যিম (রহ.) লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন ঈদের সালাত ঈদগাহে আদায় করেছেন। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাত আদায়ের জন্য ঈদগাহে যেতেন। (সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং- ৯৫৬)

হজরত আলী (রা.) বলেন, দুই ঈদে সালাত আদায় করার জন্য খোলা মাঠে যাওয়া সুন্নত। (আলমুজামুল আওসাত, তাবারানী, হাদিস নং- ৪০৪০)

বর্তমান সময়ে শহরে ঈদগাহ তথা উন্মুক্ত জায়গা কম বিধায় অধিকাংশ মাসজিদে ঈদের জামা'আত হয়। উন্মুক্ত ময়দান না থাকা এবং বৃষ্টি বাদল ও ঝড়-তুফান ইত্যাদির কারণে মাসজিদে ঈদের সালাত আদায় করা হলে তাতে সুন্নতের খেলাফ হবে না। ওযরের সময় মাসজিদে ঈদের সালাত আদায় করা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَصَابَ النَّاسَ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ . صلى الله عليه وسلم . فَصَلَّى بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ.

'আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় বৃষ্টি হলে তিনি সাহাবীদের নিয়ে মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করেন। (সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস নং- ১৩১৩)

প্রশ্ন-৪ প্রশ্ন: যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী কী কী?

আয়িশা সিদ্দিকা, মৌলভীবাজার, সিলেট

উত্তর: যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী নিম্নরূপ:

ক) ইসলামের অনুসারী হওয়া অর্থাৎ মুসলিম হওয়া

খ) স্বাধীন হওয়া

গ) নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া ও তা স্থীতিশীল থাকা।

ঘ) নিসাব পরিমাণ অর্থের এক বছর পূর্ণ হওয়া

ইসলামের অনুসারী হওয়া : কাফিরের ওপর যাকাত ফরয নয়। কাফির ব্যক্তি যাকাত প্রদান করলেও আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন না। আল্লাহ বলেন,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَٰرِهُونَ .

"তাদের সম্পদ ব্যয় শুধু মাত্র এ কারণে গ্রহণ করা হবে না যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে কুফুরী করেছে। অলসভঙ্গিতে ছাড়া তারা সালাতে আসে না এবং মনের অসন্তুষ্টি ও অনিচ্ছায় নিয়ে খরচ করে।" [সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৫৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ – إِلَّآ أَصْحَٰبَ ٱلْيَمِينِ – فِى جَنَّٰتٍ يَتَسَآءَلُونَ– عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ – مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ – قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ – وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ – وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ – وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ – حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ .

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী; কিন্তু ডান দিকের লোক ছাড়া। তারা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধীদের সম্পর্কে। বলবে, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছে? তারা বলবে, আমরা সালাত পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না। আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। এমনকি আমাদের মৃত্যু এসে গেছে।" [সূরা মুদ্দাসসির: ৩৮-৪৭]

এ থেকে বুঝা যায় ঈমান না আনা ও ইসলাম গ্রহণ না করা এবং পরকালকে অস্বীকার করা, ইসলামের বিধি-বিধান না মেনে চলার কারণে কাফিরদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে।

স্বাধীন ব্যক্তি: ক্রীতদাসের কোনো সম্পদ নেই। কোনো সম্পদ থাকলেও তা তার মালিকের সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "সম্পদের অধিকারী কোনো ক্রীতদাস যদি কেউ বিক্রয় করে, তবে উক্ত সম্পদের মালিকানা বিক্রেতার থাকবে। কিন্তু যদি ক্রেতা উক্ত সম্পদের শর্তারোপ করে থাকে তবে ভিন্ন কথা।" (দেখনু, সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল মুসাক্বাত, অনুচ্ছেদ: খেজুরের বাগানে কারো যদি চলার পথ থাকে বা পানির ব্যবস্থা থাকে, সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: বেচা-কেনা, অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি ফল সমৃদ্ধ খেজুর গাছ বিক্রয় করে।

নিসাবের মালিক হওয়া: কোনো ব্যক্তির কাছে এমন পরিমাণ সম্পদ থাকবে, শরী'আত যা নিসাব হিসেবে নির্ধারণ করেছে। সম্পদের প্রকারভেদ অনুযায়ী এর পরিমাণ বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। অতএব, মানুষের কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকলে বা নেসাবের কম সম্পদ থাকলে তাতে যাকাত দিতে হবে না। কেননা তার সম্পদ কম। তাই যাকাত প্রদানের জন্য নিসাব পরিমান সম্পদের মালিক হতে হবে।

বছর অতিক্রান্ত হওয়া: একদিকে বছর পূর্ণ না হওয়া সত্বেও যাকাত আবশ্যক করে দেওয়ার মাধ্যমে সম্পদশালীর প্রতি কঠোরতা আরোপ করা হয়। অপরদিকে বছর পূর্তি হওয়ার পরও যাকাত বের না করলে যাকাতের হকদারদের প্রতি অবিচার করা হয়; তাদের ক্ষতি করা হয়। এ কারণে শরী'আতের বিধান একটি সীমারেখা নির্ধারণ করেছে এবং এর মধ্যে যাকাতের আবশ্যকতা নির্ধারণ করেছে। আর তা হচ্ছে নিসাব পরিমাণ সম্পদের বছরপূর্তি। এ কারণে বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোনো মানুষ যদি মারা যায় কিংবা তার সম্পদ যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। অবশ্য তিনটি জিনিস এ বিধানের ব্যতিক্রম:
১) ব্যবসার লভ্যাংশ, ২) চতুষ্পদ জন্তুর বাচ্চা, ৩) উশর। ব্যবসার লভ্যাংশ ব্যবসার মূল

সম্পদের সাথে যোগ করে নিসাব পরিমাণ এলে যাকাত দিতে হবে। আর চতুস্পদ জন্তুর ভুমিষ্ট বাচ্চার যাকাত তার মায়ের সাথে মিলিত করে দিতে হবে। আর উশর অর্থাৎ যমীনে উৎপাদিত ফসল ঘরে উঠালেই যাকাত দিতে হবে। (সূত্র, ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম-৩)

প্রশ্ন-৫ ঃ আমি একজন দর্জি। জামা-পাজামা ইত্যাদি বানানো আমার পেশা। লোকেরা জামা-পাজামা, সালোয়ার, কামিস ইত্যাদি তৈরি করার জন্য কাপড় ও মাপ দিয়ে যায়। সে মোতাবেক আমি জামা-পাজামা ইত্যাদি বানিয়ে দেই। অনেক সময় কিছু টুকরা কাপড় বেঁচে যায়। সেই টুকরা কাপড়গুলো আমি কাজে লাগাই। এটা কি আমার জন্য জায়েয ও হালাল হবে? এক্ষেত্রে আমার করনীয় কি?

আমিনুল ইসলাম, সাতমাথা, বগুড়া

উত্তর ঃ মাপ মুতাবিক জামা-পাজামা ইত্যাদি যথাযথভাবে বানিয়ে দেয়া আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর এজন্য তারা আপনাকে মজুরি দেয় এবং জামা-পাজামা ইত্যাদি বানানোর জন্য প্রয়োজন মত কাপড়ও দিয়ে যায়। মাপ অনুযায়ী জামা-পাজামা ইত্যাদি বানানোর পর কিছু কাপড় যদি বাড়তি থাকে তাহলে সে কাপড় বা কাজের উপযোগী টুকরা কাপড় থাকলে মালিককে ফেরত দেয়া আপনার কর্তব্য।

কেননা সে কাপড় আপনার নয় বরং যিনি জামা-পাজামা ইত্যাদি বানাতে দিয়ে গেছেন তার। আপনি নিজে সে কাপড় ব্যবহার করা কিংবা কোনো গরিবকে দান করা আপনার জন্য জায়েয হবে না। বরং সেটা খেয়ানত করা হবে এবং আপনি খেয়ানতকারী হিসেবে পাপী ও গুনাগার হবেন। তবে বাড়তি কাপড় আপনি মালিককে দেয়ার পর মালিক যদি আপনাকে দেয় তাহলে আপনি তা নিজেও ব্যবহার করতে পারবেন কিংবা কাউকে দিতেও পারবেন ■

ফতোয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ

সম্মানিত ক্রেতাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পবিত্র মাহে রামাদান উপলক্ষ্যে আগামী ১৫ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের বইগুলো নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্রে পাইকারী ৪২% এবং খুচরা ৩৫% কমিশনে বিক্রয় করা হবে।

ডাক ও কুরিয়ারযোগে দেশের যে কোন জেলায় বই পাঠানো হয়।

বিক্রয় কেন্দ্র :

বাংলা বাজার ঃ ৩৪/১ নর্থ ব্রুক হল রোড, দোকান নং-১৫ (নীচতলা), ঢাকা। ০১৭৪১-৬৭৭৩৯৯

কাঁটাবন ঃ কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। ০১৬১২-৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত বই পড়ুন, জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করুন।

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে বিশেষ কমিশনে বই কিনুন!

এই অফার চলবে ১৫ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত

পাইকারী ৪২% এবং খুচরা ৩৫% কমিশনে ক্রয় করুন

নং	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	দারসুল কুরআন সংকলন-১-২	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	১৪৫/-
২	দারসুল কোরআন সিরিজ-১-৩	প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ	৪১০/
৩	দারসুল হাদীস সিরিজ-১-৩	ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া	৪৬০/-
৪	কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা	খুররম মুরাদ	১৭০/-
৫	আল কুরআন এক মহাবিস্ময়	ড. মরিস বুকাইলি	১০০/-
৬	সাহীহ্ আল্ বুখারী ১-৫	ইমাম বুখারী (রহ)	২৭৭০/-
৭	সহীহ মুসলিম ১-৮	ইমাম মুসলিম (র)	৪১২০/
৮	জামে আত-তিরমিযী ১-৬	ইমাম তিরমিযী (র)	২৩৯০/-
৯	সুনান আবু দাউদ ১-৬	ইমাম আবূ দাউদ (র)	২২৮০/-
১০	সুনান আন-নাসাঈ ১-৬	ইমাম নাসাঈ (র)	২২৬০/-
১১	মুসনাদে আহমাদ (১)	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র)	৩৫০/
১২	রিয়াদুস সালেহীন ১-৪	ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র)	১৩৩০/-
১৩	শু'আবুল ঈমান	ইমাম বাইহাকী (র)	১২০/-
১৪	সীরাতে ইবনে হিশাম	আকরাম ফারুক অনূদিত	৪৫০/-
১৫	আবু বাকর আছ্ছিদ্দিক (রা)	ড. আহমদ আলী	৭৫০/-
১৬	উসমান ইবনু আফ্ফান (রা)	ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক	৩৫০/-
১৭	আসহাবে রাসূলের জীবনকথা ১-৭	ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ	২৩৪০/-
১৮	তাবি'ঈদের জীবনকথা ১-৪	ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ	১৩৮০/-
১৯	ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	১৮০/-
২০	ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক ধারণা	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১৬০/-
২১	কবিরা গুনাহ	ইমাম আয যাহাবী (র)	১৮০/-
২২	আমরা সেই সে জাতি (১-৩)	আবুল আসাদ	৩৯০/-
২৩	বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস	আব্বাস আলী খান	৪২০/-
২৪	আল আকসা মসজিদের ইতিকথা	এ এন এম সিরাজুল ইসলাম	৮০/-
২৫	উসমানী খিলাফাতের ইতিকথা	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৭৫/-
২৬	মুসলিম নারীর হিজাব ও সালাতে তার পোষাক	শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (র)	৬০/-
২৭	ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী	ড. মুসতাফা আস্ সিবায়ী	১৪০/-

২৮	নারী অধিকার পর্দা ও নারী পুরুষে মুসাফাহা	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১০০/-
২৯	পর্দার আসল রূপ	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৩০/-
৩০	দি সোর্ড অব আল্লাহ	লে. জেনারেল এ.আই. আকরাম (অব.)	৩৫০/-
৩১	দৈনন্দিন জীবনে তাকওয়া	ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক	১৪০/-
৩২	মদিনা মুনাওয়ারার ইতিকথা	এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম	২০০/-
৩৩	মক্কা মুনাওয়ারার ইতিকথা	এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম	৬০০/-
৩৪	ইবনুল কায়্যিম (রহ)	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	৪৪০/-
৩৫	আদর্শ মানব মুহাম্মাদ (সা)	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৭০/-
৩৬	আল্লাহর দিকে আহ্বান	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৪০/-
৩৭	ইসলামী নেতৃত্ব	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৬০/-
৩৮	রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পঠিত দু'আ	ইমাম ইবনে কাইয়েম (র)	১৩০/-
৩৯	ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট ও কর্মপদ্ধতি	শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	৬০/-
৪০	সুদ	শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান	৬০/-
৪১	আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব (১-৩)	আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানাবী (র)	৪২০/-
৪২	আল্লাহর পরিচয়	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৩০/-
৪৩	সফল জীবনের পরিচয়	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৭০/-
৪৪	রাসূলুল্লাহর শিক্ষাদান পদ্ধতি	ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ	৪০০/-
৪৫	ইসলামের দৃষ্টিতে পোষাক পর্দা ও সাজসজ্জা	ড. আহমদ আলী	৩০০/-
৪৬	তাযকিয়াতুন নাফস	ড. আহমদ আলী	৩০০/-
৪৭	ইসলামের শাস্তি আইন	ড. আহমদ আলী	৪০০/-
৪৮	ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ সেবা ও সংস্কার	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	২২০/-
৪৯	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য	অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম	৩৫/-
৫০	আল্লাহর হক মানুষের হক	জাবেদ মুহাম্মাদ	২৫০/-
৫১	ইলমুল ফিকহ ঃ সূচনা ও ক্রমবিকাশ	ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক	৪০০/-
৫২	ইমাম বুখারী (রহ.) জীবনি ও হাদীস চর্চা	ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন	৪০০/-
৫৩	নামায কায়েম কর	অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন	৩০/-
৫৪	রোযার তাৎপর্য ও বিধিবিধান	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১১০/-
৫৫	গবেষণাপত্র সংকলন (১-২৫)	সংকলিত	২১৯৫/-
৫৬	যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলন	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৬০/-
৫৭	ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত	জাবেদ মুহাম্মাদ	২৬০/-

যোগাযোগ : ৩৪/১ নর্থ ব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট, (নীচতলা)
বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭৪১ ৬৭৭৩৯৯
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। মোবাইল : ০১৬১২-৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০
E-mail : dhakabic@gmail.com, web : www.dhakabic.com